সঞ্চিতা

পঞ্চদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

T4
41
V.15
391569

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর, পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত।

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র ও রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রাবলী

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ – ১৯৪১

চিঠিপত্র ।। পঞ্চদশ খণ্ড

যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে
লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০২

সম্পাদনা : শ্রীভবতোষ দত্ত

© বিশ্বভারতী ১৯৯৫

ISBN-81-7522-003-1 (V.15)

ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী । ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড । কলিকাতা ১৭
লেজার সেটিং শ্রীসঞ্জয় সাউ
অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া । ৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট । কলিকাতা ১২
মুদ্রক শ্রীঅরিজিৎ কুমার
লেজার ইম্প্রেশনস । ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪

বিষয়সূচি

যদুনাথ সরকারকে লিখিত পত্রাবলি	৯
বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্রাবলি	৩৫
যদুনাথ সরকার -লিখিত পত্র	৮৫
যদুনাথ সরকার -লিখিত প্রবন্ধ :	
The New Leaven in Bengal	৯৬
স্যাডলাব কমিশনের প্রতিবেদনে বোলপুব ব্রহ্মচর্যাশ্রম	১০৪
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত পত্রাবলি	১১৩
'জীবনকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা	১২৬
গ্রন্থপবিচয়	
রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ	১৩১
ববীন্দ্র-যদুনাথ পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ	১৪৭
রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ	১৭৫
রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ	১৮১
বামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ, পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ	২২৭
বিজ্ঞপ্তি	২৪২

যদুনাথ সরকারকে লিখিত

১

১৬ অক্টোবর ১৯০৫

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার[১]

করপ্রকোষ্ঠেষু

ভাই ভাই এক ঠাঁই

ভেদ নাই ভেদ নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৮ মে ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার প্রেরিত বইগুলি ও পত্র কিছুকাল হইল পাইয়াছি— নানা ব্যস্ততায় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই— ক্ষমা করিবেন।

রাসমালা[1] পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। দেখি যদি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু মুস্কিল এই, মনটা ওদিকে নাই আবার এ সব কাজ জবরদস্তি করিয়া হয় না।

মাঝে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল আবার সেই দিকে চলিয়াছি। ছুটিতে স্থির হইয়া বসা ঘটিল না। কোথাও যাইব মনে করিয়াছিলাম —এইখানকার এই মাঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতেও মন সরে না।

রথীন্দ্র বিদ্যালয়ে একটি বেশ ভাল magic lantern[2] দিয়াছে —কবে ইহার মধ্য দিয়া আর একদিন আপনি জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের দৃশ্য উদঘাটন করিয়া দিবেন? মাঝে মাঝে এক একবার দর্শন দিয়া যাইবেন।

অজিত[3] ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি পাইয়া আগামী সেপ্টেম্বরে অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবেন। তাঁহার সহিত আপনার এখানে পরিচয় ঘটিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া এখানেই তিনি অধ্যাপনার কার্য্য করিবেন। ইতি— ২৫শে বৈশাখ ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
২১ জুন ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিনয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক নিবেদন

দীনেশ বাবুর পুত্র[১] শ্রীমান অরুণ সহসা বাড়ি ছাড়িয়া পাটনা অভিমুখে কোথায় আসিয়াছে। সে আমাদের আশ্রমের ছাত্র— সম্প্রতি এফ, এ পাস করিয়াছে। তাহার ভাই ও ভগ্নীপতি তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। আপনি দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন। পত্রবাহকদের মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইবেন।

আশাকরি আপনার খবর ভাল। বিদ্যালয় খুলিয়াছে— অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ৭ই আষাঢ়, ১৩১৭

ভবদীয়

।থ ঠাকুর

৪
৪ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শকুন্তলার অনুবাদের[১] প্রুফ কয়েকদিন হইল পাইয়াছি।

বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্নপ্রায়। ছেলেরা অভিনয়[২] করিবে—

তাহারই আয়োজন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলিয়া এতদিন আপনাকে চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ একটা অভিনয় হইবে এবং আগামী কল্য আর একটা অভিনয় হইয়া বিদ্যালয়ের ছুটি হইবে।

আপনি যেভাবে তর্জ্জমা করিয়াছেন ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায় ইংরাজিতে তাহা কোনোমতেই উপাদেয় হয় না এইজন্য বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজিতে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলেই ভাল হয়।

আপনি শুনিলাম কোথায় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। একবার মনে করিয়াছিলাম আমাদের অভিনয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিব কিন্তু আপনার আসা সম্ভবপর হইবে না আশঙ্কা করিয়া এবং নিশ্চিত দিন স্থির না হওয়াতে আপনাকে ডাকিতে পারি নাই।

আশ্রমে আবার কবে দেখা দিবেন? ইতি ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২৬ অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

শিলাইদ, নদিয়া

সবিনয় প্রীতি সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের জন্য ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের picture post cards[১] সংগ্রহ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম

—আপনি যে আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ইহাতে বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি ছুটির কয়টা দিন শিলাইদহে পদ্মাতীরেই কাটাইবার আয়োজন করিয়াছি।[২]

৭ই পৌষের উৎসবে বিদ্যালয়ে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল —তখন বোধ হয় আপনাদের ক্রিষ্ট্মাসের ছুটি আরম্ভ হইবে। ইতি ৯ই কার্ত্তিক, ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

৩ ডিসেম্বর ১৯১০

ওঁ

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত ছবিগুলি আজ পাইয়াছি। সেগুলিকে সাজাইয়া একটি ফ্রেমে বাঁধাইয়া লইবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

ক্রিষ্টমাসের সময়[১] জগদানন্দ ক্ষিতিমোহনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাপক এক্‌জিবিশন দেখিবার জন্য এলাহাবাদ যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন— কিন্তু আমার এখান হইতে নড়িবার ইচ্ছা নাই। আপনি সে সময় আসিলে আনন্দ লাভ করিব।

ময়মনসিংহে বোধহয় আগামী সরস্বতী পূজার সময় সাহিত্যসম্মিলন[২] বসিবে। ডাক্তার বসু সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন— তিনি আমাকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিবেন —সহজে নিষ্কৃতি দিবেন বলিয়া আশা করি না। উত্তরবঙ্গ সম্মিলনীর সঙ্গে তাহার দিনক্ষণে কাটাকাটি হইতেও পারে। ভাঙা শরীর লইয়া অধিক নড়াচড়া করিতেও পারি না। এই সকল কারণে এখনো কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আলোচনা হইতে পারিবে। ক্রিষ্টমাসের ছুটিতে ডাক্তার বসু শিলাইদহে পদ্মার চরে আমার সঙ্গ ইচ্ছা করিয়াছেন— কিন্তু মাঘোৎসবের জন্য আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে এই জন্য সে সময়ে কোথাও যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২০ এপ্রিল ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার শরীর ভাল নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। ১লা বৈশাখের উৎসবে আপনার প্রত্যাশায় ছিলাম। আসিলেন না দেখিয়া স্থির

করিয়াছিলাম হয় ত ২৫শে বৈশাখে আসিবেন।

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী লিখিয়াছেন তিনি বিদ্যালয়ে খুলিলে আষাঢ় মাসে এখানে আসিবেন। অতএব এই গরমে এখন আপনার গতিবিধির কোনো পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবেনা।

এখানে কলেজ স্থাপনের পরামর্শ[১] করিতে কলিকাতায় আশু মুখুয্যে মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলাম তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন আমাকে টাকা জমা দিতে হইবে না— জামিন হইলেই চলিবে। অবশ্য ক্লাসের ঘর ও সাজ সরঞ্জামে টাকা লাগিবে। এ টাকা সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব কি না সন্দেহ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে ছিল আপনার সঙ্গে দেখা হইলে পরামর্শ করা যাইবে।

আমার ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসব[২] এখানকার ছেলেরা করিবে। সে সময়ে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ যে উৎসব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশনের দিনে— সে কবে আমি জানি না। সে সভায় আমি উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করি না— যদি কোনোমতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কোথাও পালাইতে পারি সে চেষ্টা করিব।

আমার জন্মোৎসবের ভার যদি সাহিত্য পরিষৎ গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত চাঁদার টাকা লইয়া তাঁহারা সাহিত্যসম্বন্ধীয় কোনো একটা কাজের ভার নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। ওদিকে দৃষ্টি দিয়া কোনো ফল হইবে মনে করি না। এই সমস্ত বাহ্য আড়ম্বরের উদ্যোগ আয়োজনে আমি যে কিরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি তাহা

অন্তর্যামীই জানেন। আপনার নিরাময় সংবাদ পাইলে নিশ্চিন্ত হইব। নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানিবেন। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[*৩১ অগস্ট ১৯১১]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু—

এবার আমাদের পূজার ছুটি সম্ভবত ৮ই আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইবে। ৬ই অথবা ৭ই আশ্বিনে শারদোৎসব[১] হইবার কথা। সে সময়ে আপনি যদি আসিতে পারেন তবে বিশেষ আনন্দিত হইব। তখন রামানন্দ বাবুও আসিবেন কথা আছে। ছুটির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিতান্ত দায়ে না পড়িলে আমি কোথাও যাইব না— অতএব আপনি যখনি আসিবেন দেখা হইবে। বায়ু পরিবর্ত্তনে আপনি কি বিশেষ উপকার পান নাই? আমার শরীরটাও ভাল চলিতেছে না। যকৃৎটাই বিকল হইয়াছে। ইতি বৃহস্পতিবার। [১৪ ভাদ্র ১৩১৮]

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯
২৩ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

পাইওনিয়র[১] আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ইহার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়া আছি। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আসিবেন। ছেলেরা ৮ই পৌষে অচলায়তন[২] অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। দেখা হইলে অনেক কথা হইবে। ইতি ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এতদিন কলকাতায় ছিলেম। বিশেষ কাজের তাড়ায় আগামীকাল মঙ্গলবার ভোরবেলায় বোলপুরে রওনা হতে হবে। শুক্রবার পর্য্যন্ত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের এই সুযোগ হারাতে হল। ইতি সোমবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৩ জানুয়ারি ১৯১৪

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বোটে চড়িয়া জলে জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছি— ১১ই মাঘের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ডাঙায় নামিতে হইবে। তাহার পরে কবে পশ্চিমে যাত্রা করিব এখনও নিশ্চয় বলিতে পারি না— কারণ, বিদ্যালয়ের কাজে অনেকদিন গাফিলি করিয়াছি কিছুদিন সেখানে স্থির হইয়া বসিতে না পারিলে ক্ষতি হইবে। হয়ত ফাল্গুন চৈত্রে কিছুদিনের ছুটি মিলিতে পারে তখন আপনাকে খবর দিব— কিন্তু আমার প্রতি নির্দ্দয় আচরণ[১] করিবেন না— সম্মান আমার পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। ইতি ২৯ পৌষ [১৩২০]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
৬ ডিসেম্বর ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

হরিদাসবাবু যে নিয়মে বিশ্বগ্রন্থ[১] প্রকাশের ভার লইতেছেন তাহাতে আমার সম্মতি আছে। এবার যখন কলিকাতায় যাইব তখন

তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কথা ঠিক করিব।

আমার শরীর মন বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে এইজন্য পরিশ্রম করিয়া কোনো বড় কাজ সম্পাদন করিবার আশা আর রাখি না। এখন শান্ত হইয়া পড়াশুনা করিব এবং এখানকার ছেলেদের লইয়া দিন কাটাইব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। কিন্তু অদৃষ্ট আমাদের এমন গাড়িতে জুড়িয়া দেয় যে, বাহক যখন থামিতে চায় তখন তাহার পিছনের গাড়ি তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলে। কিছু না কিছু কাজের দায় অনাহূত আসিয়া কাঁধে চাপে, তাহার কাছ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে তাহাকে নিকাশ করিতে হয়।

আমেরিকার Lincoln সহর আমাদের বিদ্যালয়কে একটি ভাল ছাপাখানা[১] উপহার দিয়াছেন। চালাই কি করিয়া? আর কিছু নয় ছেলেদের শিক্ষা ও আমোদ হয় অথচ খরচ উঠিয়া যায় এমন উপায় কিছু বলিতে পারেন? চিন্তামণিবাবুকে[২] বলিয়াছিলাম এই প্রেসকে তিনি যদি তাঁর ব্যবসায়ের অন্তর্গত করিয়া লন তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। তিনি পারিয়া উঠিবেন না লিখিয়াছেন। এখানে এমন তৈরি ছাপাখানা এবং বিনাভাড়ায় ঘর লইয়া কি কোনো ব্যবসায়ী ইহার ভার লইতে পারেন না? আপনি কাহাকেও জানেন? হরিদাসবাবু[৩] কি এ প্রস্তাবে রাজি হইবেন? ইস্কুলমাষ্টারের হাতে এসব জিনিস দিতে ভয় হয়— দুদিন বাদে ইহার অক্ষরে এবং ভগ্নাংশে বোলপুরের প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া যাইবে— অবশেষে ভাবীযুগের প্রত্নতাত্ত্বিকদল ইহার ইতিহাস লইয়া ভয়ঙ্কর দলাদলি বাধাইয়া দিবে। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

৭ই ও ৮ই পৌষের উৎসবে আশ্রমবাসীরা আপনাকে প্রার্থনা করে। দর্শন যদি পাই তবে কাজও হয় আনন্দও হয়।

Education Commission-এর[৫] প্রশ্নাবলী পাইয়াছি। আপনাদের পরামর্শ পাইলে উত্তর দেওয়া সহজ হইত। ইতি ২০ অগ্রহায়ণ ১৩২৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ছাপাখানায় বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

১৩

[৫ অগস্ট ১৯১৯]

ওঁ

কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদেষু

রামেন্দ্রবাবুর শোক-সভায়[১] সভাপতিত্ব করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়িয়াছি। আপনি বিচিত্রা লাইব্রেরি হইতে যখন যে কোনো বই ইচ্ছা করেন পাইবেন। রোগশয্যা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র বোলপুরে দৌড় দিব। ইতি

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
[২৭ অগস্ট ১৯২১]

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দেশে ফিরে এসে[১] অবধি আপনাকে দেখবার জন্যে একান্তমনে কামনা করেচি। কটকে আপনাকে পত্র লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম এমন সময়ে আপনার পত্র এবং বই কয়টি পাওয়া গেল। কবে দেখা হবে? যদি ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে আপনার আসবার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ না থাকে তাহলে সময় পেলে আমি কটকে গিয়ে দেখা করতে চাই। অনেকদিন আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলুম বলে শীঘ্র সময় পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা করবার ছিল। আগামী নভেম্বরে অধ্যাপক Sylvain Levy আশ্রমে এসে কিছুদিন অধ্যাপনা করবেন।[২] সেই সময়ে আপনাদের মত লোকের সমাগম আশ্রমে নিতান্ত দরকার হবে। ইতি [১১ ভাদ্র ১৩২৮]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
২ জুন ১৯২২

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি কিছুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম[১] যে আপনার মনে হয়ত আমার সম্বন্ধে কোনো কারণে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে।

সেজন্য মনের মধ্যে বেদনা অনুভব করিয়াছি এবং সেইজন্যই আপনাকে বিশ্বভারতীর সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম।

আমার কাজের বিরুদ্ধে আমার দেশের লোকের একটা প্রতিকূল ধারণা আছে, ইহা আমার পক্ষে বিষম বাধা। কিন্তু আপনার মধ্যে সেই বিরুদ্ধ মনোভাব আমার কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে, আপনার চিঠির মর্ম্ম এখনো স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেই পারিতেছি না। বিশেষতঃ আপনি অনেকবার এখানে আসিয়াছেন, সকলপ্রকার অভাব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এখানকার প্রতি স্নিগ্ধভাব রক্ষা করিয়াছেন*; আপনি যে এখানকার আবহাওয়া বা কার্য্যপ্রণালীকে নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন এমন আভাস তখন আপনার নিকট হইতে একবারও পাই নাই।

আপনি বলিয়াছেন, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে, এবং এইরূপ জ্ঞানের শিক্ষক ও সাধকগণকে "হৃদয়হীন, শুষ্কমস্তিষ্ক, 'বিশ্বমানবের' শত্রু", বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয়। একথা যদি সত্য হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে ইহার ফল বিষময়। কিন্তু একথার আপনি কোন প্রমাণ পাইয়াছেন?

এতকাল পর্য্যন্ত এখানে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশির ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান। যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্ত্তি হইয়াছে। অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেশে ত হাইস্কুল যথেষ্ট আছে তাহার উপর আর একটা বোঝা

বাড়াইবার প্রয়োজন কি ছিল। তাহার উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। আমার বক্তব্য এই যে এদেশে হাইস্কুলে ছাত্রেরা যেটুকু শেখে এখানকার ছাত্রেরা অন্তত সেইটুকুই শিখিত। আপনি কি কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্পপরিমাণ শিক্ষার মধ্যেই accurate knowledgeকে উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দাঁড়াইয়া গেছে যে, প্রমাণসঙ্গত প্রণালীতে যে মনস্বীরা জ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা "বিশ্বমানবের" শত্রু?

একথা আপনার জানা আছে যে, যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষা লাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন সেই অশিক্ষা-বশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি,— এবং সেই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণতবুদ্ধি বালকদের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না ইহার বেশি আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত অনুসন্ধানপ্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে ; আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি, হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চ্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি। আপনার প্রতি চিরদিন যে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছি তাহার প্রধান কারণ আপনি ব্যক্তিগত অন্ধসংস্কার বা মিথ্যা ভাবুকতার মোহে আকৃষ্ট হইয়া সত্যসন্ধানের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না। আমাদের দেশের অনেকে যাঁহারা ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য

তাঁহাদের সাধনা এরূপ বিশুদ্ধ নহে। আপনার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই এখানকার কাজে আপনার সহায়তা পাইবার জন্য এমন আগ্রহের সহিত বারম্বার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনাকে যদি "বিশ্বমানবের" শত্রু বলিয়া মনে করিতাম তবে আপনার সংস্রব এমন করিয়া কামনা করিতাম না।

আচার্য্য বসুর অনুসন্ধানলব্ধ তত্ত্বগুলিকে দেশের যে-একদল লোক প্রাচীন আর্য্যঋষিদের ঝুলির মধ্যে গুপ্ত আছে বলিয়া কল্পনা করেন আপনার পত্রে আপনি তাঁহাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; আপনার চেয়ে আমি তাহাদিগকে কম অশ্রদ্ধা করি না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুরাতন পুঁথির বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেই প্রণালীকে যাঁহারা অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন আপনি তাঁহাদের কথাও লিখিয়াছেন। আমি যে সে দলের নহি আপনি যদি তাহার প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা আলোচনা করিবেন, আমি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, প্রামাণিক প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র আলোচনা ও উদ্ধার করিবার জন্য, যথাসাধ্য উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। এখানকার লাইব্রেরিতে তাহার প্রমাণ আছে।

আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্যদৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোন কোন বন্ধুমহলেও প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি— কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্ম্মল নহে, কিন্তু আপনার মধ্যেও এইরূপ প্রতিকূলতা যদি এমন প্রবল আবেগে উগ্র হইয়া ওঠা সম্ভবপর হয় তবে তাহা আমার পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্তবিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষিবিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্য্যোপযোগী, তাহার কার্য্যক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রণালী বহুব্যাপক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ ও আরোগ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য হাঁসপাতাল সমেত একটি শিক্ষাবিভাগ খুলিবার চেষ্টা করিতেছি, হয়ত শীঘ্র ছোট আকারে তাহার গোড়াপত্তন করিতে পারিব। এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে "বিশ্বমানবের" বিরুদ্ধতা করা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করেন না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই exact knowledgeএর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?

আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে "খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নবন্যায়ের কচ্‌কচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকসার" উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যাহাকে "বোলপুরের বায়ু" বলেন সে কি কেবল এই সকল ফসলেরই উপযোগী? বেদান্তের নূতন ভাষ্য ও নবন্যায়কে বিদ্রূপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্তু "কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ ও আলিপনার নক্‌সা" সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ ও আর্ট সমালোচকদের

সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে— দেখিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তাঁহাদের মানসিক বায়ু পরিশুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা বহুমূল্য গণ্য করেন। আমার ইচ্ছা যে, আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞানসাধনায় বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকেও সকলে সম্মান করিতে শেখে।

আপনার চিঠির ভাষা হইতে বুঝিলাম "বিশ্বমানব" "বসুধৈব কুটুম্বকং" প্রভৃতি ভাষা ও ভাবের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হইয়াছে। অসংযতভাবে এইসকল শব্দের অমিতব্যবহার অত্যন্ত বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা হয়ত তাহা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন ছাত্রদের মধ্যে আমি একজনকেও জানি না যে ব্যক্তি বিশ্বমানব বা বসুধৈব কুটুম্বকং লইয়া প্রবন্ধে বা গ্রন্থে, বক্তৃতায় বা কবিতায় কোনো আলোচনা করিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র ছাত্রকে জানি যাহার মন ভাবাবিষ্টতায় অভিভূত। কিন্তু মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য সাধনে প্রকৃতি দেবীর নিজের কি কোন হাত নাই, আমাদের আশ্রমের "ভক্তিবাষ্পাকুল বায়ু"র আর্দ্রতাতেই কি মন তৈরি হইয়া উঠে? এখানকার একটি ছাত্র চুরিও করিয়াছে সেজন্য কি এখানকারই বায়ু দায়ী? বৈজ্ঞানিক বায়ুতে কোনো বিকার কাহারও ঘটে না?

আমার ব্যক্তিগত প্রভাবকেই হয়ত আপনি দোষ দিতে চান। সে সম্বন্ধে আমার দুটি মাত্র কথা বলিবার আছে। আমার জীবনে আমি ভাবাবেগের যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি কি ভাবাকুল হইয়া কেবলি রসবিলাসে জীবন কাটাইলাম?

আমি কি কাজের জন্য কোন উদ্যোগ কোন ত্যাগ কোন সাধন করি নাই! সেই সাধনায় কি কাঠিন্য নাই? চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ করাতেই কি কেবল যাথাতথ্যের প্রয়োজন, কাজে প্রকাশ করিতে কি শৈথিল্যত্যাগ ও বুদ্ধি এবং কল্পনার সংযম লাগে না? অতএব আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে কেবল ভাবাবেগের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোন প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের "এরোপ্লেন" কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল "আনন্দেই সৃষ্ট" হইয়াছে, ইহার মধ্যে সঙ্কল্প নাই, চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই, দুঃখ নাই? এখানকার ছাত্রেরা কি তাহা দেখিতে পায় না?

দ্বিতীয় কথা, আমার শিক্ষা, আমার মতি এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যের অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনাপ্রণালী শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। এখানে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে করেন না— তাঁহারা নিজেরা পরামর্শ করিয়া কাজ করেন। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে যদি আমার অভিমান থাকিত তবে আমি নিজেই কর্ত্তৃপদ লইতাম। এখানকার বায়ু একমাত্র আমার ভাবাবেশের দ্বারা কলুষিত হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ আপনি যদি সন্ধান করিতেন তবে জানিতেন আমার ভাবের সঙ্গে এখানকার অধ্যাপকের ভাবের মিল নাই, আর

এখানকার ছাত্রদের পনেরো আনা রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমার ভাবের প্রতি আস্থা রাখে না। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্যকে আমি বাধা দিই না, ইহাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

আপনার চিঠি পড়িয়া ব্যথিত ও বিস্মিত চিত্তে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি। আপনার মনে আমি ক্ষোভের কোন্ কারণ ঘটাইয়াছি যাহাতে আমাদের সম্বন্ধে আপনার এরূপ বিরুদ্ধতা ঘটিল তাহা অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিলাম না। আপনি "ফিলিষ্টাইন", আপনার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী "বিশ্বমানবের" ক্ষতিকর, এমন কথা আমি কোনোদিন প্রকাশ্যে বা গোপনে আভাসেও প্রকাশ করি নাই কারণ ইহা আমার চিন্তাতেও আসিতে পারে না। আপনার পত্রে বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে যে উগ্রতা আছে তাহাতে সন্দেহ হয় তাঁহাদের সঙ্গে হয় ত আপনার বাদপ্রতিবাদ ঘটিয়া থাকিবে। আমি তাহা জানিও না এবং তাঁহাদের আলোচনায় ঘরের কোণেও কোনদিন যোগ দিই না— যদিও একথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ করি যে, বাংলার আর্টিস্টদের সম্বন্ধে ও আর্টসাধনা সম্বন্ধে আপনি যে মত যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আমি মিলি না।

আমাদের দেশে অল্প যে কয়জন সাধকের প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে আপনি তাহাদের মধ্যে একজন। এই কারণে আমার কর্ম্মের প্রতি আপনার এমন অবজ্ঞাবিমিশ্রিত অশ্রদ্ধার তীব্রতায় আমি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের এখানে ত্রুটির অভাব নাই, ত্রুটি অন্যত্রও আছে, কিন্তু যথাবিহিতরূপে আপনি কি তাহার সন্ধান ও যথোচিতভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বিশ্বভারতীর সংকল্প মাথায় লইয়া ভারতবর্ষে যখন ফিরিলাম তখন সহায়তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে আপনাকেই সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু

যখন বিশ্বভারতীর সহিত আপনার নাম আপনি সংযুক্ত রাখিতে চান না তখন তাহা প্রত্যাহরণ করিব; তৎসত্ত্বেও ভাবুক বলিয়া আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সত্যসাধক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করিব। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Recd. Darjiling, 6 June 1922]

১৬

৩০ নভেম্বর [১৯২৭]

ওঁ

মাননীয়েষু

অধ্যাপক বগ্‌ডানভের[১] নাম জানেন কি না জানি না। পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, সুদীর্ঘকাল পারস্যে কাটিয়েচেন। ফরাসী ও জর্ম্মান ইনি মাতৃভাষার মতোই জানেন। অপরপক্ষে লোকটি নিরীহ। অনেকদিন আশ্রমে ছিলেন বলে এঁকে ভালো রকমই জানি— যদি সাধ্য থাকত তাহলে এঁকে আশ্রমেই রাখতুম। এখন ইনি আফগানিস্থানে কর্ম্মে নিযুক্ত কিন্তু ভারতবর্ষে থাকবার জন্যে একান্ত উৎসুক। ইনি শুনেচেন যে, আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পারসিক ভাষা অধ্যাপনার কাজ খালি আছে— ইনি প্রার্থী। ভারতীয় কোনো মুসলমান পণ্ডিত বিদ্যায় এঁর সমতুল্য নন একথা নিশ্চিত জানবেন। লোকটি সুযোগ্য, ইংরেজি ভাষাতেও পুরো দখল আছে। আপনি নানা উপদ্রবের মধ্যে আছেন শুনেচি-- নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে

পারবেন ও বিশ্ববিদ্যালয়কেও মুক্তি দেবেন আশা করে আছি। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

১০ জানুয়ারি ১৯৩১

খাইলাম

অতি উত্তম

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১৮

১১ জুন ১৯৩৩

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আগামী কালকের কর্ত্তব্য সমাধা হলে পর্শু লিখব।

আজ অনেকটা ভালো আছি কিন্তু দুর্ব্বলতা আছে। এ জায়গাটি ভালো লাগচে। ইতি [২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ [

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্যামকান্ত সর্দ্দেশাই[১] একদা শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে, তখন আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য প্রদেশের ছাত্র প্রায় কেউ ছিল না। কিন্তু সে যেমন সকল দিক থেকে আমাদের আশ্রমের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এমন অন্য কোনো ছাত্র আমরা দেখি নি। পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপ সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়— কিন্তু বোধশক্তিবান যে-চিত্তবৃত্তি বিদ্যাকে এবং চারিদিকের পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত ক'রে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে তা অল্পই দেখা যায়। সেই শক্তি ছিল শ্যামকান্তের তাই সে আমাদের অত্যন্ত আপন হয়ে উঠেছিল,— কিছুই তার কাছে বিদেশী ছিল না। সে আমাদের আশ্রমকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সে অধিকার করেছিল আমাদের হৃদয়। আমরা তাকে সকলেই ভালোবেসেছিলুম। তার সময়কার এমন কোনো ছাত্র আমাদের ওখানে ছিল না বাংলা ভাষার অধিকারে যে তার সমকক্ষ ছিল।[২] তাছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তার অনুরাগ এবং প্রবেশ ছিল স্বাভাবিক। এই দুই পথ, দিয়েই তার মন আমাদের আশ্রমের আদর্শে ও জীবনযাত্রায় নিজেকে সহজেই বিস্তারিত করতে পেরেছিল। দূর গৃহ থেকে এসেছিল শ্যামকান্ত, কিন্তু আপন হৃদয়মনের শক্তিতে সে আমাদের একান্ত নিকটস্থ হয়েছিল, এবং এখনো নিকটেই আছে।

ইতি ১১ই জুন ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
২৬ এপ্রিল ১৯৩৪

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু

থীসিস্[১] সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই। সেই কারণে নাম সই করে দেওয়া গেল।

এবার চলেছি সিংহল অভিমুখে[২] সে সংবাদ বোধ করি খবরের কাগজে পেয়ে থাকবেন। জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হয়ে যাব তার পরে সেখানেও তীরে বসে সমুদ্রের হাওয়া খাবার সুযোগ ঘটবে। এই হাওয়া খাওয়াটার সঙ্গে স্থূলতর অন্নের সংযোগ সাধন করতে হবে। সেই কথাটা চিন্তা করলে মন ক্লিষ্ট হয়— কিন্তু ভিক্ষুকের ভাগ্য কিছুকাল ধরে পশ্চাৎ থেকে তাড়না করচে— ঝুলিটা প্রশংসা-বাক্যেই বেলুনের মতো ফুলে ওঠে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে—[৩]

বল্‌তে বলতে দীর্ঘপথ বেয়ে ফিরে আসি। দুঃখের কথা আর দীর্ঘতর করব না। নববর্ষের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি
১৩ বৈশাখ ১৩৪১

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত

১
১৯ জুলাই ১৮৯৭

ওঁ

যোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটিতে উপস্থিত হইয়া আহার ও আলাপ করিলে বড় সুখী হইব। যদি ভোজন সম্বন্ধে আপনি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন তবে আহারের পরেও আসিতে পারেন;— আমাদের ভোজটা হিন্দু-মুসলমানী। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটা উত্তর পাঠাইবেন। ইতি। ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২
১৪ অক্টোবর ১৮৯৭

ওঁ

যোড়াসাঁকো
২৯শে আশ্বিন [১৩০৪]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। প্রদর্শনীর সংকল্পটা ছাড়িতে হইয়াছে— কারণ, লোকে বড় একটা গা করিল

না। আপনি যদি আপনাদের অঞ্চলের সমস্ত শিল্পদ্রব্যজাতের তালিকা পাঠাইয়া দেন ত আমাদের স্বদেশ ভাণ্ডারের[১] কাজে লাগিবে।

আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ভারতীর সম্পাদকীয় কার্য্যভার[২] আমি গ্রহণ করিতেছি। আপনাকে সত্বর একটা কিছু প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে। সাধনা আর বাহির করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। ভারতীর দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্যে সাধন করিতে হইবে।

তিলকের সমস্ত খবর[৩] কাগজে পড়িয়াছেন। এক্ষণে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিবার খরচা সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আপনাদের অঞ্চলের জমিদারবর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু জোগাড় করিতে পারেন না? আমরা মেয়েদের কাছ হইতেও কিছু কিছু পাইতেছি।

আমি দুই এক দিনের মধ্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিব। যদি তিলকের চাঁদা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিবার থাকে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বাড়ির ঠিকানায় শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখিবেন।

এবার আমার হাতে যখন কাগজ আসিতেছে তখন আপনার আর নিস্তার নাই। নিয়মিত লেখার জন্য আপনার প্রতি নিয়মমত জুলুম চলিবে। পূর্ব্বে হইতেই জ্ঞাপন করিয়া রাখিলাম —কারণ, দস্যুবৃত্তির মধ্যেও একটু ধর্ম্ম থাকা চাই। আপনি কবে ফিরিতেছেন?

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
[১৮৯৮]

ওঁ

[বৈশাখ, ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনার "ভূগোল" গ্রন্থ পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বইখানি আমার মনের মত হইয়াছে। স্কুলে গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না কিন্তু আশা করি সন্তানহিতৈষী পিতা মাত্রেই আপনার এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ছেলেদের ভূগোল শিক্ষা দিবেন।[১] বইখানি দোকানে বাহির হইয়াছে কি না খবর পাইতে ইচ্ছা করি।

ভারতী পাইয়া থাকিবেন। কিছু লেখার প্রার্থনা করি।[২] প্লেগের বিভীষিকায় কয়দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতি সোমবার।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
[১৮৯৮]

ওঁ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারসম্ভাষণমেতৎ

আপনি নূতন ভারতী পান নাই শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং ভারতীর সমস্ত কর্ম্মভার হিরণ্ময়ীর

উপরে। আমার নিকট যে ভারতীটি রহিয়াছে আপনাকে পাঠাই। প্রথম সংখ্যাটি মনের মত হয় নাই। আষাঢ়ের লেখাটি পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। আমরা সকলে ভাল আছি।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

২০ এপ্রিল ১৯০৫

ওঁ

বোলপুব

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

নববর্ষের প্রিয়সম্ভাষণ জানিবেন। নিশ্চয় বাড়ি গেছেন। সব খবর ভাল ত?

একটি ছাত্রের আবেদন[১] পরপৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় এমন আরো অনেক ছাত্র আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন জানিতে ইচ্ছুক আছি।

আমি ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অর্শ রোগ প্রেরণ করিয়াছেন —এবার দেশের জন্য কিছু করা হইল না, ঘরে বসিয়াই প্রচুর রক্তপাত করিতেছি।

ভাণ্ডার[১] বাহির হইয়াছে— প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভাণ্ডার হইয়াছে। ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই। ইতি ৭ই বৈশাখ ১৩১২

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
২৭ এপ্রিল ১৯০৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুব

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের স্কুলে দুটি মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে— তাহাদিগকে আপনার নির্দ্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। যে সকল ছেলের বয়স বারো বৎসরের অধিক নহে তাহাদের কাছে কিছু প্রত্যাশ্যা করিবেন না। নিতান্ত কচি এবং সম্পূর্ণ ঝুনো এই দুটোকেই বাদ দিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলি ভাণ্ডারে চালান দিব।

কথাসরিৎসাগরের তর্জ্জমায় কোনো অধ্যাপককে লাগাইয়া দিব। পঞ্চতন্ত্র ছেলেদের দিয়া তর্জ্জমা করাইয়া লইব।

অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিত" এখানকার দুটি ছাত্র[১] তর্জ্জমা করিতেছে— প্রায় শেষ হইয়াছে। মনে করিতেছি নিখিলবাবুর ঐতিহাসিক চিত্রে ছাপিতে পাঠাইব।

ধর্ম্মপূজার খোঁজ[২] লওয়া যাইবে।

আমাদের দেশে "নেশন" ছিল না ও নাই সে কথা সত্য —তাহার পরিবর্ত্তে কি আছে বা ছিল সেইটেই ভাল করিয়া বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে খোলসা করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারিবেন।[৩]

এবারকার ভারতীতে খেয়ালখাতা[৪] নামক একটা নির্লজ্জতার সৃষ্টি হইয়াছে সেটাতে আমাদিগকে বড়ই কাতর করিয়াছে। আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয়বন্ধুরা যখন যাহা খুসি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে না— সরলা হঠাৎ সেগুলিকে পাঠকসমক্ষে তুরী [তূরী] ভেরী দামামার কোলাহল সহকারে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে আমি, বিশেষতঃ বড়দাদা, অত্যন্ত ধিক্কার অনুভব করিতেছি। ভবিষ্যতে এই সমস্ত লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছি তাহা পালিত হইবে কি না জানি না কারণ, আজকাল দোকানদারিই সব চেয়ে নিদারুণ হইয়া দয়াধর্ম্ম গ্রাস করিতে. উদ্যত হইয়াছে।

পরিষদের শৈশব বিভাগের ভার[৫] সম্পূর্ণ আপনাকেই লইতে হইবে। ইহাকে লাল ফিতার উদ্বন্ধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন না। ইতি ১৪ই বৈশাখ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

১২ ডিসেম্বর ১৯০৫

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি পড়িয়া যাহা বুঝিলাম সেইরূপই সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাহা হউক আমাকে লইয়া টানাটানি করিয়া কি লাভ? বস্তুত দেশ যদি প্রস্তুত হইয়া না থাকে তবে আমি মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কেবল আমারই মাথার পক্ষে অসুবিধা— তাহাতে জাতীয় বিদ্যালয়ের মত বৃহৎব্যাপারের কোনই সুবিধা হইবে না। টাকা এ সকল কাজে যে আকর্ষণে অজস্র আসিয়া পড়ে তাহা ভাবের আকর্ষণ— আমাদের দ্বারা ধনীলোকের চরণ আকর্ষণ নহে। আমি নিশ্চয় জানিতাম ময়মনসিংহের মহারাজ টাকা দিবেন না। তাঁহারা কোনো দিন উচ্চভাবের দ্বারা চালিত হন নাই— তাঁহাদের অভ্যাস ও সংস্কার সর্ব্বপ্রকার মহৎ ত্যাগস্বীকার ও দুষ্কর তপশ্চর্য্যার বিরোধী। হঠাৎ একটা আন্দোলনের বেগে কতদিনের জন্য কতটুকুই বা আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে? গৌরীপুরকে আমি ঠিক চিনি না —কিন্তু তাঁহার মন্ত্রদাতা মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রতি আমার লেশমাত্র শ্রদ্ধা নাই— আমি ইঁহাদের কাছে যাতায়াত করিয়া বৃথাই সময় নষ্ট করিয়াছি।

ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে

এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো জন্মেই "লীডার" বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাট মাত্র— যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব— কিন্তু "নেতা" হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা "নেতা" বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি
২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩১২

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮
২ মে ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

বিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের চিঠি[১] পাঠাইতেছি। ইহা হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ও তিনি কি কি কাজে কিরূপ ব্যাপৃত আছেন বুঝিবেন। পারিশ্রমিকের কথা পড়িয়া দেখিয়া যদি কিছু বাড়াইতে পারেন ত ভাল নতুবা ব্রাহ্মণ যাহা পাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। বইগুলির যদি ইতিমধ্যে আনাইয়া দিতে পারেন তবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বিলম্ব হইবে না।

আমিও আমার বিদ্যালয় দেড় মাসের জন্য বন্ধ করিয়া বিশ্রামের চেষ্টায় আছি। ইতিমধ্যে শিক্ষা-পরিষদের জন্য আমার সাহিত্য প্রবন্ধ[২] চতুর্থ কিস্তি লেখা হইয়াছে— পরিষদের ছুটি ফুরাইলে কোনো একদিন পড়িয়া আসিব— কিন্তু আপনাকে কি সভায় উপস্থিত দেখিতে পাইব ? না পাইলে ও আপনার চিরপ্রসন্ন মুখ না দেখিলে আমার পড়িয়া সুখ হইবে না।

রংপুর আমার প্রতি[৩] অত্যন্ত উপদ্রব সুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈবলক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরেজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? এই বেলা আপনাদের রংপুরের শাখাটিকে সাবধান করিয়া দিন। দোহাই আপনাদের— আমারও আর সভা সমিতি এবং টানাটানি সহ্য হয় না। কি উপায় অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব তাহার একটা উপায় বলিয়া দিবেন।

আশা করি ভাল আছেন ও আনন্দে আছেন। ইতি ১৯শে বৈশাখ ১৩১৪।

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

১৮ মে ১৯০৭

ওঁ

[বোলপুর]

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এখানে আসিয়াই তিনি শতপথ ব্রাহ্মণ যেখান যাহা পাওয়া সম্ভব আনাইয়া লইবেন। তাঁহার আসিতে আর প্রায় দুই সপ্তাহ আছে। তিনি একবার কাজে লাগিলে তাঁহার বিলম্ব বা শৈথিল্য দেখিতে পাইবেন না— এ সকল কাজে তাঁহার নিষ্ঠা আশ্চর্য্য। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০
২৬ জুন ১৯০৭

ওঁ

কলিকাতা

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রাংশ আপনাকে পাঠাই যথাবিহিত ব্যবস্থা সত্বর করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি বলেন ত তাঁহাকে আমি এখনি কাজে লাগাইয়া দিব।

আমি এবার বরিশাল ও চট্টগ্রাম গিয়াছিলাম।[১] দুই জায়গাতেই সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদের জেলা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। একটা প্রশ্নের তালিকার মত করিয়া দিলে জেলার নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর তাঁহারা আনাইয়া লইতে পারেন। ভিন্ন জেলার উপভাষাগুলির তৌলন ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহারও বিবরণ চান। একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া এই কাজটা সারিয়া ফেলুন। মফস্বলের লোকদিগকে একবার ধরাইয়া দিলেই অতি সহজেই আপনারা সফলকাম হইবেন। দেরি করিবেন না। অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
২ জুলাই ১৯০৭

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয় শতপথ সুরু করিয়া দিয়াছেন। এখানে সোসাইটির প্রকাশিত শতপথ তিন ভল্যুম আছে— সেই পর্য্যন্ত শেষ করিতেই অনেক দিন লাগিবে ইতিমধ্যে বাকি অংশ বাহির হইয়া যাওয়া সম্ভব— অথবা অন্যত্র হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ হইতে পারে। মোদ্দা কথা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় একবার যখন শতপথ লইয়া পড়িয়াছেন তখন উনি ফিরিবেন না।

আমি দীর্ঘকাল এখানে অনুপস্থিত ছিলাম। এখন যে প্রবন্ধ-পাঠের জন্য আবার কলিকাতা যাতায়াত করিব এমন সম্ভাবনা বিরল।[১] যদি কোনো জরুরি কাজে নাকে দড়ি দিয়া কলিকাতায় টানিয়া লইয়া যায় তবেই রাজধানীতে আমার শুভাগমন হইবে এবং তদুপলক্ষ্যে প্রবন্ধ পাঠ করাও অসম্ভব নহে। আপনি একবার দয়া করিয়া এখানে পদার্পণ করিবেন আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা— সে কি একেবারেই সম্ভাব্যের বাহিরে? এখানে আসিলে মফস্বল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে। ইতি ১৭ই আষাঢ় ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৯ জুলাই ১৯০৭

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র[১] পড়িয়া দেখিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্ত বিশারদ মহাশয়কে আমি জানি। ইনি কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন— সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার অধিকার সাধারণ পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশি। লোকটি অত্যন্ত ভাল। ইঁহার সহিত পরিচয় হইলে আপনি খুসি হইবেন। ইতি ১৩ই শ্রাবণ ১৩১৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মফস্বল সাহিত্য পরিষদের শাখাগুলির জন্য একটা প্রশ্নাবলী তৈরি করার কি হইল?

১৩
[১৮ শ্রাবণ ১৩১৪

ওঁ

[*বোলপুর
৩রা আগস্ট ১৯০৭]

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

হঠাৎ কন্যার পীড়ার[১] সংবাদে বোলপুরে আসিতে হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদের সাহায্য-জন্য যে কয়খানি বইয়ের

দরকার তাহার তালিকা আপনাকে পাঠাইয়াছি। তাহার একটা ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাঁহার কাজে প্রবৃত্ত আছেন। আদর্শস্বরূপ আপনার অনুবাদখানি[১] দেখিবার জন্য তিনি উৎসুক আছেন— কবে পাওয়া যাইবে? অনেককাল আপনাদের কোনো খবর পাওয়া যায় নাই। কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি পরামর্শ এ সমস্তই মাঝে মাঝে জানিতে ইচ্ছা হয়। ইতি শনিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

১১ জানুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয়নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শাস্ত্রীমহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের কতকটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। ছাপা আরম্ভ করাই তাঁহার ইচ্ছা। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইলে গ্রাহক ও অনুবাদক উভয়েরই উৎসাহ হয়। নতুবা এতবড় বৃহৎগ্রন্থ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করিয়া ছাপিতে দিলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে —সেটা ঠিক সঙ্গত হইবে না বলিয়া বোধ করি। এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আমাকে জানাইবেন। অন্ততঃ আগামী বৈশাখ হইতে যদি প্রকাশ আরম্ভ হয় তবে এখন হইতে গ্রাহকদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া

রাখিতে পারেন। মাসে মাসে বা প্রতি তিন মাসে বাহির করিবার কোনো বাধা দেখি না।

আপনার শাশুড়ি ঠাকুরাণীর যেরূপ পীড়ার সংবাদ জানিতাম তাহাতে এ সময়ে আপনাকে এ পত্র লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। আশা করি আপনারা ভালই আছেন। ইতি ২৬শে পৌষ ১৩১৪

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনি ত বাসা বদল করিয়া বড় মুস্কিলেই ফেলিলেন। নূতন বাসার নাম ও নম্বর এ বয়সে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। যদি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র না পান ত নিশ্চয় জানিবেন আপনাকে ভুলি নাই কিন্তু আপনার বাসা ভুলিয়াছি।

কন্‌ফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে[১] আহ্বান করার সংবাদ পাইবামাত্র নানা পক্ষ হইতে গালিসংযুক্ত এত বিনামী পত্র পাইয়াছি যে, আমি যে কোন্ দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কন্‌ফারেন্স মঞ্চে যখন মাথায় কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব

—বাবা, তুমি কোন্ পক্ষের লোক আমাকে বলিয়া যাও— তাহা হইলে আমি যে কোন্ দলে আছি সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না।

"ধ্বনিবিচার"[১] পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম —কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরো অনেক শাখা প্রশাখায় বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। যথা, আপনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের আদ্যক্ষর সম্বন্ধে যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন অন্তাক্ষরেও তাহা বিস্তারিতভাবে খাটাইয়া দেখা কর্ত্তব্য— কচ্‌কচ্ (চ), কট্‌কট্ (ট), কন্‌কন্ (ন), কর্‌কর্ (র), কল্‌কল্ (ল), কস্‌কস্ (স)— এই শব্দগুলির আদ্যক্ষর একই কিন্তু অন্তাক্ষরের পার্থক্যে কেন পৃথক্ অনুভূতি প্রকাশ হইতেছে তাহা আপনার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করা এক্ষণে সহজ হইয়াছে। আপনিও যে ইহার আলোচনা করেন নাই তাহা নহে। প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে এবং সেইজন্যই সেই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্তত বাংলা ভাষায়

রচিত হইয়াছে এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

আমি চৈত্রমাসটা এখানে কাটাইয়া তবে কলিকাতার দিকে ফিরিব এইরূপ আমার অভিপ্রায়— বিধাতার অভিপ্রায় কি তাহা জানি না। আমাকে আপনি এখনো নূতন কর্ম্মে জুড়িয়া দিবার চক্রান্ত করিতেছেন? আমার কি সেই বয়স? আমার বনগমনের কাল প্রায় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন কেবল পাকা দাড়ি নাড়িয়া দূর হইতে পরামর্শ দেওয়াই আমাকে শোভা পাইবে— আর কি কাজ করিতে পারিব? এমন কি, কলমটাকেও বিসর্জ্জন দিবার সময় হইয়া আসিয়াছে। যে হতভাগা ঠিক জায়গাটাতে থামিতে জানে না সে যে তালকানা— আশা করি আমার এ ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। ইতি ১১ই ফাল্গুন ১৩১৪

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

২৪ নভেম্বর ১৯০৮

ওঁ

বোলপুর

সবিনয়নমস্কার নিবেদন—

বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আপনার মন হইতে কি দয়ামায়া সমস্ত দূর হইয়া গিয়াছে? আমার আপীল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর— with cost? আপনি জানেন আমি আত্মরক্ষার জন্য যতদূরেই পলায়নের চেষ্টা করি না কেন, আপনারা ডাক দিলে[১] সাড়া না দিয়া থাকিতে

পারি না— সেই জন্যই আপনাদের দয়া প্রার্থনা করি। যেখানকার কাজ শেষ করিয়াছি সেখানে আপনারা আবার ফিরিয়া ডাকিলে আমি রক্ষা পাইব কি করিয়া? কর্ম্মফলও ত এক জায়গায় আসিয়া নিঃশেষিত হয় অন্তত তাহা এক পর্ব্ব হইতে পর্ব্বান্তরে নূতন রূপে নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করে। আমার কর্ম্মও তাহার ক্ষেত্রের লীলা শেষ করিয়া কি গোলাবাড়ির ইতিহাস সুরু করিতে পাইবে না? কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করিব না— বিবাদ ত নয়ই। অনুরোধ রাখিবার চেষ্টা করিব— অর্থাৎ বাহিরের ব্যাঘাত যদি গুরুতর হইয়া না উঠে তবে বর্ত্তমান অবস্থায় আমার যেরূপ সাধ্য আছে সেইরূপই সাধন করিব। কিন্তু একটা ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া আছে। এক ভদ্রলোক হুঙ্কার[১] নাম দিয়া কতকগুলি উগ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন; আমার অনুমতি না লইয়াই তাহা আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি খুলনা ন্যাশনাল স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করিতেছিলেন সেখানে রাজদূত তাঁহাকে রাজদ্রোহের অপরাধে ধরিয়াছে। এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে খুলনায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে পুলিসের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি— সেখানকার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের পত্রও দেখিয়াছি হয় ত শীঘ্রই ডাক পড়িবে। এই টানাটানি আমার পক্ষে নিদারুণ— এদিকে আমার শরীরও এখন একেবারেই অপটু— যদি বোলপুর হইতে খুলনায় নাড়াচাড়া ঘটে তবে আমি যে সম্পূর্ণ আস্ত থাকিতে পারিব এমন আশা করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাকে আপনাদের জবাব দিতেই হইবে— নতুবা ডাক্তার কবিরাজে জবাব দিবে। সব কথাই ত শুনিয়া রাখিলেন —আমি ছোটখাট কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব কিন্তু যত্নে কৃতে যদি না ঘটিয়া উঠে তবে ক্ষমা করিবেন। সাহিত্য পরিষদের প্রতি আমার

অন্তরের শ্রদ্ধা আছে অতএব যদি কখনো সেবায় ত্রুটি ঘটে তবে তাহা ক্ষমতার অভাবে— তাহাতে সেবকের অপরাধ লইবেন না। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

[*১৬ ডিসেম্বর ১৯০৮]

ওঁ

[*বোলপুর]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

যাহা বলিয়াছিলাম[১] লিখিয়া দিবার চেষ্টা করিব। রিপোর্টে ছাপিয়া বাহির করিবার মত কোনো কথা বলি নাই তবে রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশে, যতটুকু মনে পড়ে লিখিয়া দিব।

কতকগুলি পুঁথি আছে— কবে নিশ্চিন্তমনে সেগুলি পরিষদের হাতে দেওয়া যাইতে পারে?

আমার পিতৃদেবের ছবিখানি[২] যদি আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দেন তবে মন সুস্থির হয়। ইতি ১লা পৌষ ১৩১৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
৯ মে ১৯০৯

ওঁ

কালকা
C/o. U. Ganguly Esq

শ্রদ্ধাস্পদেষু

শব্দতত্ত্ব এবং অন্য গদ্য গ্রন্থগুলি[১] যথাসময়ে আপনার করকমলে গিয়া পৌঁছিবে। আমার প্রকাশকবর্গ যে আপনাকে ভুলিয়া আছেন ইহা আমি মনে করি নাই। আজই তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া দিলাম।

আমার শরীর বিশেষ একটু অসুস্থ হওয়ায় এই গ্রীষ্মের দিনে দূর পথ অতিবাহন করিয়া আজ কালকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যদি ভাল থাকি তবে কিছু দিন এখানে যাপন করিব।

অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই। আরো দীর্ঘকাল হয় ত দেখা হইবে না। স্মরণে রাখিবেন।

লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বদান্যতায় আমাদের বিদ্যালয় রক্ষা পাইয়াছে।[২] তাঁহার একখানি ছবি সংগ্রহ করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে যদি পাঠাইয়া দেন তবে বড় উপকৃত হইব। এ সম্বন্ধে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারি নাই।

ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় করুন। ইতি ২৬শে বৈশাখ ১৩১৬।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯
১৪ জুলাই ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ
নদীয়া

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

চিঠিখানি[১] পড়িয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। আমার খনিতে যত গভীর করিয়াই খনন করুন খনিজ পদার্থতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন না— আমার কাব্যে কেবল একটিমাত্র দুর্ভাগা কবিতায় খনিজ বস্তুর সংস্রব আছে— সে ঐ সোনার তরী— কিন্তু সে ত মগ্নপ্রায়।[২] অতএব পত্রলেখকটিকে আপনাদের বৈজ্ঞানিক বাণীভাণ্ডাগারে ডাকিয়া লইবেন।

সম্প্রতি পদ্মায় বেড়াইতে আসিয়াছি। অনেকদিন আপনার কোনো সন্ধান পাই নাই। আপনাকে আমার বইগুলি পাঠাইবার জন্য প্রকাশককে তাগিদ দিয়াছিলাম— তাহাতে কোনো ফল হইয়াছে কি না সংবাদ পাই নাই।[৩] আপনার শরীর মাঝে খারাপ হইয়াছিল। এখন ভাল আছেন ত? ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিকানায় নম্বর সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আছে। যেখানে সংখ্যার কোনো সংস্রব আছে সেখানে আমি বৈদান্তিক বলিলেই হয়— অর্থাৎ একের ঊর্দ্ধেই [ঊর্দ্ধ্বেই] আমার কাছে অবিদ্যা।

২০

[*কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৯]

ওঁ

[*কলিকাতা
১৭-৯-০৯]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

বিশেষ বিঘ্ন না ঘটিলে নিশ্চয় সাহিত্য পরিষদে আপনার প্রবন্ধ শুনিতে যাইব। অপরাহ্ণ বলিতে অনেকটা সময় বুঝায়— ঘণ্টাটা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ইতি শুক্রবার [১ আশ্বিন ১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

১৩ অক্টোবর ১৯০৯

ওঁ

শিলাইদহ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

লালগোলার রাজাবাহাদুর আমার গৃহে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হইতেছে।[১] তাঁহার প্রতি আমার

সুগভীর শ্রদ্ধা আছে এবং আমার ঘরে তাঁহার শুভাগমনকে আমি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করি। এবারে যে সুযোগ হারাইলাম বারান্তরে তাহা লাভ করিবার আশা মনে রহিল।

সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হইয়া বরোদায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নহে[২] কিন্তু পাত্রটি যদি একেবারে বাণীশূন্য হয় তবে পাত্রের মুখরক্ষা হইবে কিসের জোরে। শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা এ পর্য্যন্ত আমাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন— প্রবাসে সভাসঙ্কটে কে আমাকে রক্ষা করিবে? যদি চাণক্যের পরামর্শ অনুসারে চুপ করিয়া থাকা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে লম্বশাটপটের আয়োজন করিয়া যাত্রা করিতে পারি কিন্তু তেমন অবিচলিত নিঃশব্দতার সহিত আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করিলে আপনারা কি নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিতে পারিবেন? নিশ্চয়ই সেখানকার যজ্ঞকর্ত্তারা সাহিত্য পরিষদের ইতিবৃত্ত ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন তখন কিরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা আমি আমার মূঢ়তা গোপন করিব সে পরামর্শ আমাকে দিবেন। যদি আপনারা কেহ সাহিত্য পরিষদের বক্তব্য আমাকে লিখিয়া দেন তবে সজীব গ্রামোফোনের মত আমি তাহা আবৃত্তি করিয়া আসিবার ভার লইতে পারি। আপনি বা হীরেন্দ্রবাবু যদি যান তবে আমি আপনাদের পশ্চাতে থাকিয়া কেবলমাত্র হাত পা নাড়িয়া কাজ চালাইবার ভরসা রাখি। ইতি ২৭শে আশ্বিন ১৩১৬

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
[১৫ অক্টোবর ১৯০৯]

ওঁ

[শিলাইদহ[১]]

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

রাজি।

কিন্তু আমাকে নিরস্ত্র নিঃসহায়ভাবে পাঠানর জন্য দায়ী আপনারাই। আগামীকল্য সায়াহ্লে [সায়াহ্নে] কলিকাতায় পৌঁছিব। রবিবার প্রাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শের সময় থাকিবে কি? একটু সাহস দিবেন। কবে যাত্রা করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিবেন। ইতি শুক্রবার [২৯ আশ্বিন ১৩১৬]

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
২৫ জানুযাবি ১৯১০

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদীয় উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা অসামান্য। সাহিত্য পরিষদের কর্ত্তব্য ইহাঁর আবিষ্কারগুলি বাংলাভাষায় প্রচার করা। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার

উৎসাহের অভাব হইবে না এইজন্য ভীমবাবুকে আপনার কাছে পাঠাইবেন [পাঠাইলাম] — আলাপ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ ১৩১৬

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১০

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

এতদিন চিনির কারখানা[১] আপনার মনোরাজ্যেই ছিল, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু সেটাকে দেহক্ষেত্রে বিস্তৃত করলেন কেন? ওটা একেবারে রহিত করা কি চলে না? কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা কি অসম্ভব? কলকাতার জাঁতার মধ্যে আর নিজেকে দলিত করবেন না— বেরিয়ে আসবার হুকুম এসেছে— এখন বিশ্রামের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে মহত্তর কাজে বসে যান। এ কথা আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই বলছি— আমার এ জায়গায় আপনাকে পাব এমন লোভ আমার থাকতে পারে কিন্তু আশা নেই অতএব নিরাসক্ত চিত্তেই আপনার মঙ্গল কামনা করচি।

সাহিত্য পরিষৎ ক্রমশঃ এমন সকল লোকের দ্বারা আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়চে যাঁরা খুব ভাল লোক, বুদ্ধিমান লোক, কৃতী

এবং সামর্থ্যশালী কিন্তু তাঁরা সত্যভাবে সারস্বত নন— এতে করেই পরিষদের সাত্বিকতার লাঘব হয়ে আস্‌চে সুতরাং নিত্যতার গভীরতম মূলে আঘাত পড়চে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে দারিদ্র্যটা কোনোমতেই সাংঘাতিক নয় কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনে যখন বড় বড় লোহার চাকাওয়ালা বহু মূল্যবান দমকল বসে তখন জয়েণ্টষ্টক কম্পানি খুসী হয়ে ওঠে কিন্তু দেবীর চরণরেণু প্রত্যাশী মধুকরের দল প্রমাদ গণ্‌তে থাকে। আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই রাজসিকতার স্থূলহস্তাবলেপটা নূতন এইজন্যে তার প্রতাপটা অপরিমিত এবং কেউ তাকে প্রতিরোধ করতে সাহস করে না। পূর্ব্বকালে নবরত্ন সভায় রাজা একজনমাত্র ছিলেন সুতরাং নবরত্নকে আচ্ছন্ন করতে পারতেন না ; এখন রাজা এত রকম বেরকম, তাদের সংখ্যা এত বেশি, তাদের ফরমাস এত বিচিত্র, তাদের মেজাজ এত অনিশ্চিত, তাদের ঔদার্য্যের এত অভাব অথচ দৌরাত্ম্যের এতই প্রাদুর্ভাব যে আসল জিনিষকে আর দেখবার জো থাকে না। আসল কথা কোনো জিনিষকে চালাতে হলে তার সাম্‌নেকার পথটা ত ছেড়ে দিতে হয়— আমরা কিছুতেই কাউকেই পথ ছাড়তে পারি নে —ঘোড়া ও সারথীর [সারথির] সাম্‌নে সবাই মিলে জড় হয়ে আমরা এমনি হুড়োহুড়ি করতে থাকি যে মনে করি তাতেই বুঝি অগ্রসর হবার খুব সাহায্য হচ্চে। অথচ উপায় ভেবে পাই নে —আজকাল সকল কাজেই মালমসলা এত বেশি গুরুতর হয়ে পড়েছে যে, তার খাতিরে সকলেরই কাছে আসল জিনিষটাকে আগাম বন্ধক রেখে কাজ সারতে হয়— সে বন্ধক আর উদ্ধার হয় না— চিরকাল বিকিয়ে থাক্‌তে হয়। বাড়ি গড়বার জন্যে যে রাজমিস্ত্রিকে ডাকা যায় অবশেষে সেই বাড়িটি দখল করে ধূমধাম

করে বাস করে আর গৃহস্থ চিরদিন দ্বারের বাইরে বসে গৃহকর্ত্তার ভাণ করে কাষ্ঠহাসি হেসে রৌদ্রে জলে লোককে অভ্যর্থনা করবার ভার নিয়ে থাকে।

বিদ্যালয় বন্ধ হবে ১৭ই তারিখে। বন্ধ হবার পূর্ব্বেই ছেলেরা একটা কিছু অভিনয় করবে[২]— আমাকে ত নিশ্চয়ই ছাড়বে না— সেই কথা ভাবচি। আপনার সভায়[৩] উপস্থিত থাকার প্রলোভন আমার খুবই আছে— যাবার চেষ্টা মনে জেগে থাক্‌বে নিশ্চয় জান্‌বেন— কিন্তু একথাও মনে রাখ্‌বেন আমার এইসব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল— এরা আমার সংসার পক্ষের ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে— সেইজন্যে এদের জোর বেশি— এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ। আপনাকে আমাদের শারদোৎসবে টেনে আনার আশা করা কি একেবারেই দুরাশা? কিছুতেই বিচলিত হবেন না? ইতি ৩২শে ভাদ্র ১৩১৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫
অক্টোবর ১৯১০

ওঁ

কুষ্টিয়া

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

পাব্লিকের সেবাকার্য্য হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে কতদিন থেকে চেষ্টা করচি— দূরে থাকি, চুপচাপ করে থাকি, কারো কোনো কথায়

থাকি নে, যেন মরেই গেছি এমনিতর ভান করে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি কিন্তু তবু আপনারা দয়া করেন না কেন? আপনারা কি এই কথাটাই জানিয়ে দিতে চান যে, সত্যি সত্যি না মরলে উপায় নেই ? এ রকম আভাস ইঙ্গিত প্রয়োগ করা কি বন্ধুর কাজ? সংসার এবং বিষয়কর্ম্ম থেকে একেবারে সরে পড়েছি— সুতরাং যে দাঁড় আশ্রয় করে আমি পাব্লিকের চিড়িয়াখানায় ঝুল্‌তে পারতুম সে দাঁড় ভেঙেছি— এখন ব্যাধের মত আমাকে আর তাড়া করে বেড়াবেন না। আপনাদের অনুরোধ বরাবর সাধ্যমত পালন করা আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে সেইজন্যে এখনো আপনাদের আহ্বান এড়ানো আমার পক্ষে সহজ নয়— সেই কারণেই আপনাদের দিক থেকেই দয়া হওয়া উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাকে ভিড়ের হাত থেকে বাঁচান। আমি যেটুকু পারি কাজ করচি এবং করব, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে আমি আর মিশ্‌তে পারব না। গোলে হরিবোল্ দেওয়াই ভিড়ের প্রধান কাজ, এখন আমার সে রকম উদ্যম, ইচ্ছা, এবং গলার জোর নেই। আপনাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্পূর্ণসহানুভূতি আছে— রজনী সেন মহাশয় যে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন অবসান করেছেন আমি তার পরিচয়ও পেয়েছি এবং তাঁর আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখে মুগ্ধও হয়েছি' এইজন্যে আপনাদের চেষ্টায় তাঁর দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের ভারলাঘব হয় এ আমার একান্ত মনের ইচ্ছা— কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি সেখানে আমাকে আর আহ্বান করবেন না। এক পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা বাড়াতে হয়, শেষ কালে কেউ কোনোমতেই দোহাই মানে না, নজির দেখায়। আপনি যদি পীড়াপীড়ি করেন তবে অবশ্যই

আমাকে রাজি হতে হবে— কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার তরফের কথাটা একবার আপনার সাম্‌নে উপস্থিত করলুম— আমার প্রতি যদি দয়া না হয় তবে আমিই হার মানব।

আমি কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার নামের সহযোগে "কুষ্টিয়া" এই ঠিকানা দিলেই আমি চিঠি পাব। ইতি তারিখ ঠিক জানা নেই।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬
৭ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শিলাইদা

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মিত্র[১] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B.Sc. ও আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের M.S.। ইনি গবর্মেণ্টের সাহায্যে সেখানে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে অনেকগুলি ছাত্র কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা (লইয়া) দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হরিপ্রসাদ বাবুর নিকট আমি প্রস্তাব করিয়াছি, যে সাহিত্যপরিষৎকে কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সকলে কৃষিতত্ত্ব আলোচনার একটি সভা স্থাপন করুন। হরিপ্রসাদবাবু এই

প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আপনারা যদি ইঁহাদিগকে আহ্বান করেন ও আশ্রয় দেন তবে ইঁহারা বাংলা সাহিত্যে কৃষিবিদ্যার অবতারণা করিতে পারেন। হরিপ্রসাদবাবু এই পত্র লইয়া আপনার নিকট যাইতেছেন— যদি আপনাদের সম্মতি পান তবে ইঁহার বন্ধুদিগকে আপনার পতাকাতলে তিনি একত্র সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইঁহার সহিত নিয়মাদি আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

আপনি আশা করি আমাকে আপনাদের চিত্তলোক হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন নাই— আমি অন্তরালে আছি কিন্তু উদাসীন নহি— নানা কাজ হইতে নিষ্কৃতি না লইলে কোনো কাজই হয় না বলিয়া দূরে আসিয়াছি— কিন্তু তথাপি এখনো আমাকে আপনাদের সেবক বলিয়াই জানিবেন— তবে আগে ছিলাম বাজার সরকার, কথায় কথায় সকল কাজেই হাটে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে হইত এখন শেষ দশায় কিঞ্চিৎ পদোন্নতি হইয়াছে— কিন্তু বেতন সম্বন্ধে কিছুই প্রভেদ হয় নাই— বাঁধা খোরাক মেলে না, চরিয়া খাই, কাঁটাও জোটে ঘাসও মেলে— সেজন্য কোনো আক্ষেপ করিতে চাই না। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭
২৯ জানুয়ারি ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদক মহাশয় সমীপে
বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী বর্ষে পরিষদের সভাপতিপদে শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু[১] মহাশয়কে বরণ করিবার প্রস্তাব আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আমার এই প্রস্তাব দয়া করিয়া যথাসময়ে সভাস্থলে জ্ঞাপন করিবেন।

আমার অপর প্রস্তাব এই যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[২] মহাশয়কে পরিষদের একতম সহকারী সভাপতি পদে আহ্বান করা হয়। ইতি ১৫ই মাঘ ১৩১৭

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১১

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনাদের কালেজে সাহিত্য অধ্যাপকের প্রয়োজন আছে কাগজে দেখিলাম। ভয় করিবেন না— আমি উক্ত পদের প্রার্থী

নহি। কিন্তু আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোক এই পদের জন্য উৎসুক আছেন। তিনি আমার পরিচিত এই মাত্র তাঁহার গুণ নহে। তিনি যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকটির নাম বসন্তবিহারী চন্দ্র— এম, এ। ইংরাজি সাহিত্য বেশ আলোচনা করিয়াছেন— বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রবেশ আছে—(অর্থাৎ আমার লেখাগুলোও পড়িয়াছেন এবং তাহার নিন্দা করেন না)— ইঁহাকে আমাদের বিদ্যালয়ে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু constipation-এর ধাত থাকায় এই কষা জায়গা তাঁহার সহিল না। দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিতে হইয়াছে। লোকটি অত্যন্ত সজ্জন— সেইজন্যই আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলাম— আমার বিশ্বাস আপনারা যদি ইঁহাকে গ্রহণ করেন তবে অনুতাপ করিতে হইবে না। আপনার নম্বরটা কি আমি ঠিক লিখি? ১২ত বটে? দ্বাদশ আদিত্যের সঙ্গে মিলাইয়া ঐ নম্বরটি আমি মনে রাখি। পূর্ব্বে ৬ ছিলেন— এখন তাহার ডব্‌ল হইয়াছেন ইহাও মনে রাখিবার উপায়। পরিষৎ সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইয়াছে— দেখা হইলে আপনার সঙ্গে কথা হইবে। ইতি ৩রা ফাল্গুন ১৩১৭

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯
৪ মে ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে কথাটা যে অমূলক নহে তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন— আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধবয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন— আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব— তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভারবহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি

আমাকে ভালবাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবিসম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পাঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার একপঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম— আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০
৫ মে ১৯১১

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনাদিগকে আশু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে— অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি আজ আমাকে এই গ্লানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম— কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এই জন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ

হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি ২২শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩১

১০ মে ১৯১১

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমাদের অধ্যাপক হরিচরণ একখানি বাংলা অভিধান রচনায় নিযুক্ত[১] হইয়াছেন— আপনারা যাহা চান ইনি তাহাই করিয়া তুলিতেছেন। ব্যাপারখানি প্রকাণ্ড হইবে। একবার দেখিয়া দিবেন। যদি পছন্দ হয় তবে এটা লইয়া কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয় না এমন শব্দও ইহাতে স্থান পাইয়াছে সেইটে আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের উপর এ গ্রন্থখানি রচিত ও প্রকাশিত হইলে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। ইতি ২৭শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ বসন্তবাবুর আর একখানি পত্র পাইয়াছি। জগদীশের নিকট হইতে ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমি কোনো কথাই আর কহিব না।

৩২
২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমার পুরাতন চিঠিপত্রের এক জায়গায় ছিল, আমি একদিন সমুদ্রস্নানসিক্ত তরুণ পৃথিবীতে গাছ হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। আপনি সম্পাদকের কুঠার লইয়া আমার এই গাছের স্মৃতির গোড়ায় কোপ মারিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এ ত অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া নয়, এ যে প্রাণে আঘাত করা। কেন না এ আমার প্রাণের কথা। আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই এ কথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছ কেন সমস্ত জড়জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্ব্বাঙ্গে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে— আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহুযুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে— নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই! আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ— সে আপনি আমাকে কবুল করিতে দিবেন না কেন? পাছে লোকে আমাকে উপহাস করে? আমি যদি কালো আলপাকার চাপকানপরা আপিসের কেরাণীজীবনের পরিচয় দিই তবে লোকে সেটাকে একটা সত্যপদার্থ

বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে থাকে— আর আমার যে পরিচয়টা জগৎজোড়া পরিচয় সেটাতে যদি ট্র্যামগাড়ির যাত্রী ও সীজন্ টিকিটওয়লাদের হাসি পায় তবে সে হাসি আমাকে হজম করিতেই হইবে। দেখুন, আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক রঙের মাটির উপরে যখন সূর্য্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিক্প্রান্ত পর্য্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভমুহূর্ত্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্টসুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি। অতএব ইহাকে গোপন করিবেন না। ইহাকে লইয়া আমি লেশমাত্র লজ্জা বোধ করি না। আমি মানুষ এইজন্যই আমি ধূলামাটিজল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই— ইহাই আমার গৌরব— আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে— আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইজন্যই আমার রক্ততরঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গের তালটাকে চিনিতে পারিয়া নৃত্য করে কিন্তু সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে চেনে না— এইজন্য আমার প্রাণের সুখ গাছপালার প্রাণের সুখের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে কিন্তু গাছপালা আমাকে চেনে না। আমার স্মৃতি তাহাদের মধ্যে নাই। ইহাতে কি হাসিবার কিছু আছে? আপনার Execution of dutyতে গায়ের

জোরে আমি বাধা দিব না কিন্তু নালিশ জানাইয়া রাখিলাম। ইতি
১৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৩
১৭ নভেম্বর ১৯১৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রিয় বন্ধু

সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি ত মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি— আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয় ত ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কিরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে।

"কোলাহল ত বারণ হল
এবার কথা কানে কানে"—

এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জ্জমা সুরু করিয়াছিলাম[১] বারণটা যে কতদূর সফল হইল তাহা দেখিতেই পাইতেছেন।

আপনি আছেন কেমন সে কথা লেখেন নাই। শীঘ্রই কলিকাতায় একবার যাইতে হইবে তখন দেখা করিব। ইতি ১ অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

২৭ ডিসেম্বর ১৯১৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

কোনো ঠিকানা না রাখিয়া কিছুকালের জন্য বাহির হইয়া গিয়াছিলাম।[১] ফিরিয়া আসিয়া আপনার চিঠিখানি পাইলাম। দুই একদিনের মধ্যেই আবার নিরুদ্দেশের মধ্যে ডুব মারিবার চেষ্টায় আছি। শিকারী যতই গুলি চালাইতে থাকে হাঁস তেমনি যেমন ঘন ঘন জলে কেবলি ডুব মারে আমার সেই দশা হইয়াছে। নানা কারণ বশতঃ আমি হঠাৎ দূর দূরান্তরের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছি তাই ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হইবার আয়োজন করিতেছি। চিঠিতে কাহাকেও সাড়া দেওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছি— কিন্তু আপনার ডাকে চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত কঠিন বলিয়াই মৌনব্রত ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু আমি উড়ুক্ষু— ডানা মেলিয়াছি— অতি শীঘ্রই আমি নাগালের বাহিরে পৌঁছিব— এমন কি, সেখানে গোলাগুলিও পৌঁছিবে না।

আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয় —আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর। আমার মতে আচারে বিচারে যদি আপনাকে বেদনা দিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে হয়ত মঙ্গলই হয় —কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ত বাধা নাই। এত কথা যে বলিতেছি তার কারণ এই যে, প্রতিকূলতা চারিদিকেই তর্জ্জনী তুলিয়াছে, বুঝিতেছি যে দেশের লোককে আমি ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে —সেটা যদি দোষের হয় তবে তাহা আমার বুদ্ধিরই দোষ, হৃদয়ের দোষ নহে— আপনি জানেন আমি দেশের লোককে ভালই বাসি —সেই জন্যই আমি তাহাদের ভাল চাই— ভাল কথা চাই না। এই দুর্য্যোগের দিনে এই আশাটিকে সম্বল রাখিতে চাই যে বন্ধুরা যদি বা আমার মঙ্গলের আশা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবু হৃদয় হইতে আমাকে ত্যাগ করেন নাই। ইতি ১২ পৌষ ১৩২১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৫

১১ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আপনার স্নিগ্ধ পত্রখানি পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার শেষ চিঠিখানির সুরের মধ্যে কিছু রুদ্ররসের আমেজ দিয়াছিল না কি?

বোধ হয় সেটা করুণ রসেরই ছদ্মবেশ মাত্র— সূর্য্যাস্তকালেরমেঘের মত, বাহিরে দেখিতে আগুনের রং কিন্তু একটু আঁচড় কাটিলেই অশ্রুবাষ্প বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি কিছু দীর্ঘকালের মত সমুদ্র পাড়ি দিবার আয়োজন করিতেছি বোধ করি তাই মনের ভিতরটা কিছু আর্দ্র অবস্থায় আছে— দেশকে গভীরভাবে ভালবাসি বলিয়াই এইরকম সময়টায় অনেকদিনের রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে অভিমানের কথাগুলো কিছু আতপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তাই আপনার চিঠিতে নিজেকে বোধ করি ঠিক সাম্‌লাইতে পারি নাই। সংযত হইবার বয়স হইয়াছে —অন্যকে উপদেশ দিবার বেলাতেও পাকাচুল কাজে লাগে কিন্তু নিজের দিকে তাকাইয়া দেখি কবির কোষ্ঠীতে বয়স আর কিছুতেই এগোইতে চায় না— শরীরটা শেষের পথে খুব ছুটিয়া চলিয়াছে কিন্তু স্বভাবটা সেই যে পঁচিশের কাছে আসিয়া ঠেকিয়া গেছে কিছুতেই আর প্রমোশন পাইতেছে না। আমি জানিতাম গণিতের বুদ্ধি আমারই নাই কিন্তু আমার বিধাতারও যে আমারই দশা প্রতিদিন তাহা ধরা পড়িতেছে— আমার ভিতরকার বয়সটার সম্বন্ধে কেবলি তিনি ঠিকে ভুল করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে আমার পাকাচুলের সঙ্গে আমার আচরণের বড়ই বেমানান হইতেছে। সত্য কথা যদি বলিতে হয় আপনার মধ্যেও একদিকের অঙ্ক অন্যদিকে চালিয়া দেওয়া হইয়াছে —অনেক কাল হইতেই আপনার অন্তরের দিক হইতে হরণ করিয়া আপনার পাকাচুলের দিকে পূরণ করা চলিতেছে, এ ভুলটা আজ পর্য্যন্ত সংশোধন করা হইল না। কিন্তু এখন প্রার্থনা করিবার সময় হইয়াছে আপনার শরীরের দিকটায় ভুল অঙ্কের ভার আর যেন চাপানো না হয়। ইতি ২৭ পৌষ ১৩২১

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুধবার রাত্রে কলিকাতায় যাইব— আপনার পটলডাঙ্গার বাসার সমস্যা ভেদ করিতে পারিব না। আমি লিভিংষ্টোন্ নই আমি যৎসামান্য কবি মাত্র, ইহা মনে রাখিবেন।

৩৬
২৭ জানুয়ারি ১৯১৫

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।[১] আপনার ভাই[২] আমার কিছু কবিতা হরণ করিবার চেষ্টায় আছেন আপনার পত্রে এই খবর পাওয়া গেল। ব্রাহ্মণ অভয় দিতেছি হরণের প্রয়োজন নাই, আহরণ করিবেন। দণ্ড যদি কেহ দেয় পাঠকেরা দিতে পারে, কবি দিবে না। ইতি ১৩ মাঘ ১৩২১

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

ব্যোমকেশের মৃত্যুসংবাদ[১] পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আপনারও চিঠি পাইলাম।

আমার শরীর ক্লান্ত অথচ মন ব্যস্ত হইয়া আছে। কিছুকাল

হইতে শারীরিক অবসাদটাকে বহিয়া লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া কাজ চালাইতেছিলাম। কিন্তু এমন করিয়া বেশি দিন চলে না। তাই দূরে পালাইবার আলোচনা করিতেছি। য়ুরোপের পথ বন্ধ তাই জাপান দিয়া আমেরিকায় যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে। দীর্ঘকালের জন্য যখন সুদূরে যাইবার ব্যবস্থা করা যায় তখন চারিদিকটা কেমন ঝাপ্‌সা হইয়া উঠে, মনে বাঁধন আলগা হইয়া যায়— কতকটা মৃত্যুকালের মত। তাই এখন যাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই মন দিতে পারিতেছি না। সংসার এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজন চুকাইয়া যা-কিছু উদ্বৃত্ত আছে তাহা পরপারের সদ্‌গতির জন্য নিঃশেষে প্রয়োগ করিতে হইতেছে- —বস্তুত আমি এখন তীরস্থ— তাই স্থির করিয়া কিছুতে মন দিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে একটু সুস্থ হইলেই আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব। ইতি মঙ্গলবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

৮ চৈত্র ১৩২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

২১ মার্চ্চ ১৯১৭

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

দেশে ফিরিয়া আসিয়াই[১] আপনার প্রীতিসুধাপূর্ণ পত্রখানি আমার কাছে মরুভূমির উৎসধারার মত লাগিল। আপনাদের মত

সুহৃজ্জনের কাছ হইতে চিরদিন যে সমাদর পাইয়া আসিয়াছি নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও আজও তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই ইহা যে আমার পক্ষে কি গভীর সান্ত্বনা তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

বিদেশে আপনার কথা বারবার স্মরণ করিয়াছি। কলিকাতায় দিন দুয়েক থাকিবার অবকাশ পাইলেই নিশ্চয়ই আপনার দরবারে গিয়া হাজির হইতাম। সম্প্রতি এখানে আমার বালকদের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছি। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে এখান হইতে বাহির হইবার সম্ভাবনা বিরল। সে সময়ে কি কলিকাতায় থাকিবেন। অনেক গল্প করিবার বিষয় জমিয়াছে— সেগুলো হাতে হাতে খোলসা করিতে পারিলে ভাল হয় নহিলে কালক্রমে লোকসান হইতে পারে।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯

১৮ এপ্রিল ১৯১৭

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

দুই একদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— মুহূর্ত্ত কালের জন্য অবসর ছিল না তাই এবার দেখা হইল না।

গেল বছর কিছুকাল ধরিয়া যে বেগ খরচ করিতে হইয়াছিল তাহা আমার মূলধনের চেয়ে অনেক বেশি। এখন তাই দেনা শোধ

করিতে হইতেছে। অবস্থাটা অনেকটা দেউলিয়ার মত। ব্যয় এত সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে যে, নিত্য প্রয়োজনেও টানাটানি পড়িয়াছে। কলমটা অর্জ্জুনের শেষদশার গাণ্ডীবটার মতই ভারী হইয়া উঠিল। তাই খাতাপত্র বন্ধ করিয়া চুপচাপ পড়িয়া আছি। অতএব আশা করিতেছি এখন অন্তত কিছুকালের জন্য বাংলা সাহিত্যের "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো।"

ইতিমধ্যে কথা অনেক জমা হইয়া আছে। সেগুলা হাটের মধ্যে বলিয়া হট্টগোল বাড়াইবার উৎসাহ আমার আর নাই। তাই মাঝে মাঝে বন্ধুদের বৈঠকের জন্য মন উতলা হয়। সুযোগ যদি ঘটে তবে প্রাণটা খোলসা করিয়া লইব। কিন্তু দেখিতেছি পর্দ্দা নামিয়া আসিতেছে; নাটমঞ্চে আর মন টেঁকে না। ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩২৪

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪০

১০ মে ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

কয়দিন অতিথি অভ্যাগতদিগকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাই পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

ভোরবেলা হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক মোট

বহিয়াছি এখন অপরাহ্নে বোঝা নামাইবার সময় হইয়াছে। আর ত মন লাগে না। কাজের বেলাটা এখন পিছনে পড়িয়া গেছে এই জন্যই ঐ দিক পানে এখন ছায়া পড়িবে। পঞ্চাশের উপরেও যাহাদের বয়স তাহাদেরও যদি recruit করিতে বসেন তাহা হইলে বুঝিব আপনাদের হারের পালা। আপনি সারথি, আপনার প্রবীণতা অশোভন নয় কিন্তু রথীগুলি নবীন দেখিয়াই বাছিতে হইবে।

শাস্ত্রীমহাশয়কে বাংলা শব্দতত্ত্ব বিচারে[১] বসাইয়া দিয়াছি। তাঁহার কাছ হইতে লেখা আদায়ের চেষ্টা করিলে খুব সম্ভব নিরাশ হইবেন না। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩২৪

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪১
২৩ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

VASANTAMAHAL.
MYSORE

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আমি ভ্রমণে বাহির হইয়াছি[১]— তাই আপনার চিঠি পাইতে বিলম্ব হইল। আপনি যে দুঃখ পাইয়াছেন[২] আমিও সদ্য সেই দুঃখ দহন হইতে বাহির হইয়াছি। আমার কন্যাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন রোগের কষ্টে কাতর হইতে দেখিয়াছি তাহার কোনো প্রতিকার করিতে পারি নাই— অথচ পিতার উপর শেষ পর্য্যন্ত তাহার নির্ভর

ছিল। যেখানে কল্যাণের কামনা আছে সেখানে কল্যাণের শক্তি আছে এ বিশ্বাস মানুষ কিছুতে ছাড়িতে পারে না। তাই ব্যর্থতার বেদনার মধ্যেও স্নেহের সম্বন্ধ উৎসুক হইয়া আছে। সেই সম্বন্ধ যখন চরম আঘাত পায় তখন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে এমন কোন্ বাণী আছে? আমি কেবল এই কথা ভাবি যে, যখন সত্যের দুই বিপরীত মূর্ত্তি দেখি, একদিকে স্নেহ, একদিকে বিনাশ ; একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে সংহার, তখন কোন্‌টার উপর জোর দিব? হ্যাঁ এবং না, এ দুটাই ত এ-পিঠ ও-পিঠ হইয়া থাকে ; কিন্তু দুই পিঠের মধ্যে কোন্‌টা হাঁ-য়ের পিঠ? ছবির দিক দিয়াই পটকে দেখিব, না উল্টাদিক দিয়া? কোন্‌টা হাঁ-য়ের পিঠ, ছবির পিঠ, আমি তাহা একরকম ঠিক করিয়া রাখিয়াছি— সেই থেকেই প্রাণমন দিয়া জীবনের সমস্ত তপস্যা দিয়া আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। এমন কিছু দিয়া সমস্ত হৃদয়মন ভরিতে চাই যাহাতে "মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"। যাহা যায় সে ক্ষতি ত মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি সত্যের আশ্রয়ভূমি পর্য্যন্ত যায় তবে এত বড় ক্ষতি বহন করিবার শক্তি জগতে আছে কোথায়? কিন্তু স্পষ্টই ত দেখি, ক্ষতি বহন করিয়াই না-কে পিঠের দিকে ফেলিয়াই হাঁ আপনাকে নিত্য প্রকাশ করিতেছে। তাই দুঃখশোকের মধ্যে এই প্রার্থনাই আমি ধরিয়া আছি, "রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" ইতি ৯ মাঘ ১৩২৫

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদুনাথ সরকার -লিখিত পত্র

যদুনাথ সরকার -লিখিত প্রবন্ধ : The New Leaven in India

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম

যদুনাথ সরকার

১৮৭০ – ১৯৫৮

Sarkar-abas
Darjiling 31st May 1922

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি মে ও জুন মাসের জন্য এখানে আসিয়াছি সুতরাং আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠের রেজিস্টারি পত্র কটক ঘুরিয়া এখানে পৌঁছিতে দেরি হইল। বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইলেও দুইটি গুরুতর কারণে ঐ পদ অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, তজ্জন্য মার্জনা করিবেন।

প্রথমতঃ আমি এখন দূরে থাকি, এবং আর কয়েক বৎসর পরে পেন্সন লইয়া নিম্ন বঙ্গে বাস না করিবার ইচ্ছা। সুতরাং শান্তিনিকেতনের কার্যের তত্ত্বাবধান করা, নূতন সমস্যা উঠিলে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া, আমার পক্ষে অসম্ভব। বৎসরে একবার মাত্র বার্ষিক অধিবেশনে দেখা দিলে কর্তব্য পালন হইবে না। যেখানে কাজ করিতে পারিব না, সেখানে নামে সদস্য হইয়া থাকাটা আমি নিজের পক্ষে লজ্জাকর ব্যবহার এবং ঐ সংস্থানের প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করি। এই যেমন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের ও দূরের সদস্য এত অধিক যে ৩০ জন সদস্যের মধ্যে অনেক অধিবেশনে ৭ জনও জোটে না, অধিবেশন পণ্ড হয়। এলাহাবাদের

যদুনাথের এই পত্রটি এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পত্র একসঙ্গে যদুনাথ 'বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে' প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য প্রবাসী চৈত্র, ১৩৫২। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশের সময় যদুনাথ তাঁর পত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

উকীলগণ না আসিলে কোরম হয় না। যেখানে স্থানীয় পণ্ডিত ও কার্য্যদক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নাই, যেখানে স্বাধীন আত্মনিবদ্ধ ইউনিভার্সিটি হওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে শান্তিনিকেতন দেখিয়াছি তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রদের দেহ ও হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত হইয়া, পরে তাহারা মামুলী কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর সম্পূর্ণ মনুষ্য গঠিত হইত। অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত। শুধু শিক্ষা অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে বোলপুরের কাজটা যে কাঁচা হইতেছে তাহা আপনিই আমাকে বলিয়াছেন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতিবৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্ব্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং উচ্চ প্রণালীতে কাজ কবিরা উপযোগী শিক্ষা intellectual discipline and exact knowledge, পূর্ব্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, এবং (৩) শিক্ষার পরিপক্ক চরিত্রবান একনিষ্ঠ নেতা একজন। এই তিনটি থাকিলে টাকা বা জিনিষের অভাব বাধা হয় না, এবং এ অভাবও বেশী দিন থাকে না।

আমাদের মামুলী কলেজের IA ও BA শ্রেণী চারিটি প্রকৃতপক্ষে বিলাতের ভাল সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ করে ; আর এদেশে প্রকৃত কলেজের কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম. এ ক্লাস হইতে আরম্ভ হয়। ঐ IA ও BA ক্লাসে চারি বৎসর খাটিয়া তবে 'আমাদের ছেলেরা' বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত

হয়। বোলপুরে এই শিক্ষার প্রথম স্তরটি (অর্থাৎ হাইস্কুল) অতি সুন্দর। আপনি যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে ৩য় স্তরটি (অর্থাৎ রিসার্চ বা পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ)ও বেশ কার্য্যকর হইবে— যদি ছাত্র আসে। কিন্তু ২য় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের ৪টি শ্রেণী) ওখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত. হইয়াছে সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে, তাঁহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে, তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না ; কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি অর্থাৎ উচ্চ general knowledge এবং ২ বা ৩ বিষয়ের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ— তাহাদের ঘটে নাই ; তাহাদের মধ্যভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, সে এম এর ইতিহাসে প্রকৃত কাজ করিতে চায়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বেই BAতে Economics & Political Science এবং একটি ভাষা রিসার্চ-বর্জিত কিন্তু গভীর অধ্যয়ন করিয়া আসা আবশ্যক। ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইলে শুধু সংস্কৃত জানিলে চলিবে না, গ্রীসীয় ইতিহাস মিসর ব্যাবিলনের ইতিহাস, Political Philosophyতে অগ্রে BA পাশ করা আবশ্যক, নচেৎ মনটা সংকীর্ণ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ exact knowledge, পরের অর্জ্জিত বিদ্যার মধ্য দিয়া গিয়া। তাহার পরে এবং উপরে আমরা মৌলিকতায় পৌঁছিতে পারি। এই মাধ্যমিক শিক্ষা (grind বলিতে পারেন) মামুলী কলেজে হয়, বোলপুরে হয় না।

তাহার উপর, বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledgeকে, intellectual disciplineকে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষক ও সেবকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিক "বিশ্বমানবের" শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের

(emotion) দিকে, synthesisএর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact knowledge তাহা শেখে না বরং শেখা অনুচিত, কুশিক্ষা, বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হয় "আহা! কি সুন্দর এইরূপ উড়াই মানবমস্তিষ্কের সর্ব্বোচ্চ কাজ ও সুখ।" কিন্তু কত শ্রমের কত শুষ্ক তপস্যার কত exact knowledgeএর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না। ইহার আবিষ্কারের পূর্ব্বে অসংখ্য পতঙ্গ ও পক্ষীর কেহ ছুরী ও অণুবীক্ষণ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পক্ষ ও দেহের আনুপাতিক ওজন এবং আয়তন, পক্ষের ভিতর দিয়া শক্তিবাহক রগের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শুষ্ক exact knowledgeএর পুঁজী সংগ্রহ করা পরীক্ষার পর পরীক্ষা প্রাণত্যাগের পর প্রাণত্যাগ আবশ্যক হইয়াছিল। এরোপ্লেন আনন্দে সৃষ্ট হয় নাই।

তেমনি আচার্য্য বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে জীব উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সকলেরই প্রাণ ও মৃত্যু উত্তেজনা ও ক্লান্তি আছে। আমরা অমনি উল্লাসে বলিয়া উঠি "বাঃ! ইহাই ভারতের নিজস্ব মানসিক সম্পদ। আমাদের উপনিষদ যুগের পিতামহগণই ত বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া প্রাণ আছে।" আমরা বুঝি না যে প্রাচীন ঋষিরা ভাবের উন্মেষে ঐ কথা বলেন, কিন্তু আচার্য্য বসু(র) প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, ভীষণ শুষ্ক; তিনি exact knowledge-এর সাহায্যে বিজ্ঞানাগারে পদে পদে পরীক্ষা করিয়া, সেই পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিয়া এক ইঞ্চকে কোটিভাগে বিভক্ত করিয়া, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অবিশ্বাসীর হাত দিয়া সেই পরীক্ষা করাইয়া তাহাকে নিজমতে দীক্ষিত করিতে পারেন।

তেমনি পালী ও বৈদিক সাহিত্যের গ্রন্থগুলির বিশুদ্ধ

সংস্করণের পশ্চাতে কি অগাধ শুষ্ক পরিশ্রম রহিয়াছে। এই সব সংস্করণের সম্পাদক ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে ললিতবিস্তারে তৃতীয়ার একবচন কোথায় এবং কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, বৃহদ্দেবতায় দেবগণের উপাধি ও গুণগুলির নির্ঘণ্টু প্রস্তুত করিয়াছেন। আর আমরা আর্য্যসন্তান এই উৎকৃষ্ট সংস্করণ হাতে করিয়া আত্মম্ভরিতার সহিত 'উপর চালাকী' করিতেছি, ভাব গদ্‌গদ হইয়া general remarks ঝাড়িতেছি, আর লিউম্যান ও ম্যাকডনেলের শুষ্ক শ্রমের প্রতি exact knowledgeএর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি।

আমি এখন মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্যন্যায়ের কচকচি, কেঁথা সেলাইয়ের প্যাটার্ণ, এবং আলিপনার নকসা, অথবা মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্ত নকল। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতে ও জগৎকে exact knowledge দিতে পারে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের scientific history রচনা করিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি (kechauffe´) বা অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া 'জগৎ সভার মাঝে' গ্রহণীয় নুতন জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে,— এ বিশ্বাসটা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।

বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledgeএর বিরোধী। যেমন বৈষ্ণবেরা ভক্তিবিগলিত অশ্রু হইয়া সব জিনিষ অস্পষ্ট দেখে, তেমনি বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাইতে। প্রথম হইতেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলিয়া তাহারা অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূরবীক্ষণ ব্যবহার

করিতেছে। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কোনোটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

আপনি দেখিতেছেন আমি কি অকাট দুরারোগ্য ফিলিষ্টাইন। তাহা হইবেই ত। আমি পেশাদার গুরুমহাশয় (মস্তিষ্কের, হৃদয়ের নহে), পণ্ডিত তৈয়ার করিবার চেষ্টা করি। যেখানে এই ব্যবসায়ের ওস্তাদের আবির্ভাব বা নূতন প্রণালীর কথা শুনি সেখানেই দেখিতে যাই। পুরাতন নেশনাল কলেজ দুবার, বোলপুর ৩ বার, গুরুকুল একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারই আদর্শ ও প্রণালী সর্ব্বাঙ্গীণ গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনি যখন পদ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাশ দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। আমি তাহা পূর্ণসত্য বলিয়া মানিয়া লই। কারণ আপনার যুক্তি দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়; আর আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ বারো বছরের ছেলে — আধার বিশ্বই হউক না কেন— "বিশ্বমানব" "অব্যক্ত মর্ম্মবেদনা" প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে তখন পুঁটি মাছের মুখে তিমি মাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়। আমাদের মামুলী কলেজে পাশ করা ছেলেরা যে রাজনৈতিক মঞ্চে নৃত্য করিতে করিতে 'ডেমক্রেশি' 'কনষ্টিটুসন' 'সেলফ ডিটারমিনেশন' প্রভৃতি বুলী আওড়ায় তাহাও ঠিক এইরূপ মূল্যের জিনিস।

কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। মামুলী কলেজে আমরা পেশাদার গুরু মহাশয়েরা ছাত্রের হৃদয়টার দিকে তাকাই না, শুধু মস্তিষ্কটা শানাইবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অভাবটা বাহিরের গুরু মহাশয়

—সংসার হউক, আপনার কাব্য হউক, প্রকৃতির দৃশ্য হউক —পরে পূরণ করিয়া দেয়, কারণ হৃদয়টা শূন্য থাকিতে পারে না —যেমন Palace of Artএ টেনিসন সুন্দর প্রমাণ করিয়াছেন। বোলপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের পেটেণ্ট করা প্রস্তরচক্রে মস্তিষ্ক শানায় না, exact knowledge বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে,— তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না; একমাত্র তরুণ বয়স এবং কলেজের শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাই এই অভ্যাস এই মনের ঝোঁক দিতে পারে। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে পরে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রগণ রিসার্চ ক্লাশে উঠিয়া মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে (ভাসা ভাসা synthesis বাদে) কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। অন্ততঃ তাহাদের শ্রমফল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দ্রব্য হইবে না। শুধু সংস্কৃত পড়িয়া যাঁহারা পণ্ডিত হইয়াছেন, এবং যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপীয় দর্শন অভ্যাস করিয়া তাহার সঙ্গে বা পরে সংস্কৃত চর্চা করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর মনের দৌড় ও ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। ঐ শেষোক্ত পণ্ডিতরাই প্রকৃত মূল্যবান গবেষণা করিতে পারেন।

আর একটি উপমা দিলেই আমার মনের ভাব পরিষ্কার হইবে, —এবং আমি যে কি ভীষণ ফিলিষ্টাইন সে সম্বন্ধে পূর্ব্ব স্নেহ বশতঃ আপনার যদি দু-একটা সন্দেহ থাকে তবে তাহাও লোপ পাইবে। "ইণ্ডিয়ান আর্ট ভারতের নিজস্ব জিনিস, ইহা জগৎ সভার হাতে ভারতের অমূল্য অন্যত্র অপ্রাপ্য কাজ।" বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি। আমরা বলি যে রবি বর্ম্মার ছবিতে ভাব নাই, তাহা Nature-এর দানোপযোগী নকল। এই মত প্রচারের ফলে, অবনীবাবু ও

নন্দলাল ভিন্ন আর সব নব্য ইণ্ডিয়ান আর্টের সাধকগণ প্রথমে হাত ঠিক করা কাজটি ঘৃণার সহিত ত্যাগ করিয়াছেন; প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা নাই, শরীর বিজ্ঞান পড়া নাই, ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে নানা পরীক্ষা (studies বা sketches) করিয়া চিত্রের উপযোগী, ঠিক অঙ্গভঙ্গিটি আবিষ্কার করা নাই; এক লাফে ভাবের ছবি আঁকিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন। এসব ছবির মধ্যে যাহা ভাল তাহাকে অজন্তার বা মুঘল চিত্রের নকল ভিন্ন আর বেশী কিছু বলা যায় না। অপরগুলির সব কাঁচা ও খারাপ, ঠিক শিশুর আঁকা বা cavemanএর আঁকা ছবির মত, শুধু রংগুলি তার চেয়ে ভাল। কিপলিংএর একটা গল্পে আছে যে একজন বিলাতী ভবঘুরে এদেশে এসে প্রথম এক্কা দেখে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠেন "oh how thruly Orienthal !" ইণ্ডিয়ান আর্টের চরম আকাঙ্ক্ষা এই কি যে সাহেবেরা বলিবে How truly oriental ! অর্থাৎ বিশ্বজগতের সভ্যসমাজের মাপকাঠি দিয়া ইহার বিচার হইবে না, কালা আদমীর জন্য যে একটা ভিন্ন standard আছে তাহা দিয়া ইহার বিচার করা হইবে? (কই রুইজডেল্ বা কুইপএর landscape দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! how truly Dutch ? টার্নার দেখিয়া কেহ ত বলে না oh! How truly English ?)

রবি বর্ম্মাতে ভাব নাই সত্য, কিন্তু রবি বর্ম্মাই কি ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতির দৃষ্টান্ত? র‍্যাফেল লীটন টার্নর-এ ত কেহ ভাবের অভাব, কামোচিত অনুকরণ দেখেন নাই; অথচ তাহাদের কীর্ত্তির পশ্চাতে কত anatomy, observation of Nature, "Studies" (অর্থাৎ খশড়া) আছে, তবে তাঁহাদের হাত ঠিক হইয়াছে! Sir Frederick Leighton তাঁহার Flaming June নামক চিত্রের রমণীর মাথার নীচে দেওয়া

হাতের ভঙ্গির জন্য ১৬/১৭টা Sketch করেন, পরে তাহার একটি বাছিয়া লন ও ছবিতে বসান। সেই মত র‍্যাফেলের স্কেচ (Cartoons) আছে।

অথচ আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের গুরু হইতে নবীনতম শাগরেদ পর্য্যন্ত "Art is not photography" "The imitation of Nature is a slavish practice unworthy of a true artist" "Expression is higher than fidelity to life" এই সব বুলী আওড়ান এবং ইউরোপীয় চিত্রপদ্ধতিকে জঘন্য* গালাগালি দেন। ইহার ফলে ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ প্রথম শিক্ষানবীসের হাত ঠিক করিতে যে পরিশ্রম যে প্রকৃতির অনুসরণ আবশ্যক তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া অহঙ্কারে ত্যাগ করিয়া একেবারে ভাব-প্রকাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন— ফল প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবিগুলি। সেই মত বোলপুরের ছাত্রেরা exact knowledgeকে ঘৃণা করিয়া এক লাফে synthesis এবং ভাবপ্রকাশে গিয়া উপস্থিত হইতে শিখিতেছে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্টের এবং সিন্‌থেসিস বাদ এ দুটাই plea for laziness হইয়াছে। মামুলী কলেজের ছাত্রগণ অলস হইলে, ঢিলে কাজ করিলে লজ্জা বোধ করে। ইণ্ডিয়ান আর্টের সেবকগণ এরূপ করা গৌরবের বিষয়, মানসিক স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়া গর্ব্ব করে। ইহার প্রসূত ফল জগৎসভা কতদিন গ্রহণ করিবেন দেখা যাউক।

আমি যে কেন ফিলিষ্টাইন হইয়াছি তাহা বলিতেছি। যদি বোলপুরের ছাত্রগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি বা চিত্রকর হইবে

---

* অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের ভূমিকার প্রতি লক্ষ করিয়া "Teınes Lıt. Suppl" এই মত লিখিয়াছেন।

এরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতাম না। কিন্তু দেড়শত বৎসর ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ফলে বঙ্গমাতা একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ প্রসব করিয়াছেন। আর দুইশত বৎসরের ও তাঁহার দ্বিতীয় আসিবেন না, আমার বিশ্বাস। সুতরাং বোলপুরের ছাত্রদিগকে এই আমাদের কলেজের ছাত্রদের মত সাধারণ সাংসারিক লোক বলিয়া বিচার করিতে হইবে, এক প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইবে। তাহারা অলস parasite class বা intellectual aristocracy হইবার ন্যায্য দাবী করিতে পারে না। The winds of genius blow where they list মামুলী কলেজ তাঁহাদের সৃষ্টি করিতে পারে না। বোলপুরও পারিবে না। তবে সেই প্রচ্ছন্ন জ্যোতি ক্ষণজন্মা কবি বা শিল্পী মামুলী কলেজে নাম লিখাইলে আমরা তাঁহাকে steam rollerএর চাপে পিঁশিয়া ফেলি, বোলপুরে তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ঐ ক্ষণজন্মা পুরুষ নয় তাহাদের জন্য বোলপুর কি করিবে?

আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না এজন্য যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা আপনি কল্পনা করিতে পারিবেন। কিন্তু কর্ম্মী সমাজে এই বিশ্বভারতীর সহিত আপনার খ্যাতি জড়িত থাকিবে। আমি ২৯ বৎসর কলেজে পড়াইয়াছি এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও দেশের অবস্থা (মৌলিক ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়িয়া দিন) প্রভৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি। এখন যদি আপনাকে প্রস্তাবিত পন্থার বিপদ না বলিয়া দিই তবে আপনাকে প্রতারিত করিব।

যদি ইচ্ছা করেন এবং অন্য বন্দোবস্তের মধ্যে এরূপ দ্রব্যের জায়গা হইতে পারে তবে বড়দিনের সময় ৩/৪টা বক্তৃতা বা ইতিহাসের রিসার্চ স্টুডেন্টদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বোলপুরে যাইতে পারি। গ্রীষ্মে ও পূজায় আপনাদের ও আমাদের এক সময়েই ছুটী থাকে।

এবার কি এ অঞ্চলে আসিবেন না ?

াত

শ্রীযদুনাথ সরকার

THE NEW LEAVEN IN BENGAL

(An Appreciation of Babu Rabindronath Tagore's Short Stories.)

The India we live in is not the same land as the India of our great grand fathers. Wave after wave of change has swept over the country, till at last nothing remains unaltered save the granite foundations of Hinduism. Institutions have changed so much that should the shades of our great-grandfathers revisit the land in which they lived and worked and died, they would mournfully feel themselves as much out of place in it as if it were a land of foreigners. But it is not with the outer aspects of modern Indian life that we want to deal here. These aspects, especially in their relation to the State, have been ably set forth by Mr. Cotton in his New India. Nor do we want to deal with the influence which the light and learning of the West have had upon the intellect of the East. Our concern here is with the inner life of our people as far as it has been affected by the altered circumstances of this new era. We shall here see what effect the altered conditions of society have had upon the feelings and doings of the men we live among.

The West is giving us knowledge. But knowledge is not an unmixed blessing. Nay, it may even become a curse ; for knowledge may open our eyes to miseries which cannot be remedied, knowledge may create longings which are hard to realise. Therefore, we cannot affirm that as the people now have more of knowledge they must have more of happiness. Indeed, a school of thinkers (chief among them Sir Alfred Lyall and that delightful story-teller Mrs. Flora Annie Steele) have gone so far as to hold that the new knowledge has brought more misery than happiness. Borrowing the imagery

of the Evangelists they are never tired of lamenting that this putting the new wine of Western thought into the old bottles of Eastern life has led to the bottles bursting and the wine being spilt.

We do not say that in the old life there was no sorrow and no suffering. Sorrow there was all the sorrow that must ever be the heritage of the progeny of Adam. But it was felt less intelligently, and therefore, less acutely. It was felt as a vague stirring within, felt almost like the dull sensations of the brute creation. Moreover, there were then two things to solace the human heart : Fatalism and Religiousness. The blind fatalism proverbial to Orientals furnished an ever ready explanation of the inequalities of human lots, and served to lesson the contrast between the happy and the miserable. Faith in a living God made this life a mystery and not a thing to reason about. An antidote to the sorrows of this life was supplied by the prospective bliss of the life to come. Our span of life and the pleasures and pains that flutter it, were dwarfed into utter insignificance by the side of the importance of the Life Eternal which comes from knowing Him and walking in His way.

The old life was more uniform. Its members were more in harmony with each other. In its social arrangement every one had his settled place, which he could not leave at will and which kept him in loving and friendly relation with all the rest. It was more stationary, more leisurely and it had therefore more of those affections which conservatism nourishes. There could be in it no rude transplantations of young hearts to utterly unsympathetic regions.

But the modern world moves on rapidly in the pursuit

of material gain. It has no settled habits, no old affections for its affections are not allowed the time to grow old. (I say this of its active and more successful members and not of those sweet but weaker souls which fail because they cannot adapt themselves to the spirit of the age). There is less of charity, less of kindliness for men have less leisure to think, less leisure to be considerate to others. Its sudden changes and shiftings give violent wrenches to hearts not yet hardened, for there is less of that sympathy between man and man which makes the new comer feel at home among strange faces. The paradise of this new creed, the much-vaunted 'City of Palaces' of this new civilisation, Calcutta, what is it but a vast wilderness in which a stranger is really more solitary than in solitude itself ? Two instances taken from Robindronath Tagore's "Short Stores" will illustrate our meaning. The boy Fatik leaves the free open air life and troop of playmates of his village home, comes to Calcutta, and meets with cold loveless neglect and the apathetic gaze of strangers, but none to love him, none to care for him ; the very atmosphere of the city seems to choke him. 'The Post-master' of Ulapur pines alone in his hovel of a post-office ; there are men around him but he cannot mix with them ; there is no reciprocity of feeling between the two classes : the new knowledge has parted the cultured and the cultured more widely than of yore.

The new life is thus marked by two things : new forms of suffering have been created ; and the old forms of suffering have become more manifest and more keenly, because more intelligently, felt. The altered spirit of the age has brought in new sorrows, and increase of knowledge has heightened the acuteness of old sorrows. To take a particular instance

of the latter class : — The heart of the girl Ratan (story No. 3) twines its tendrils round the post master. They cannot marry. But in the old world he would have looked upon this attachment as only the fidelity of a menial servant, and have forgotten her ; or it would have taken shape as a brute passion gratified by unholy union. But in the new world they are alive to the real nature of the attachment— the one with more, the other less, distinctness. It is this knowledge, this recognition of emotion, this intelligent suffering, that sharpens the edge of sorrow and heightens the tragedy of the parting.

Robindronath Tagore is an interpreter of this new phase of our society, of these new forms of suffering. Paradoxical though it may sound, we confidently predict that his short stores will last longer than his poems. For, those are a truer representation of life, or rather a fuller view of life as a whole than his poems— which give only a partial sketch of life and are incomplete even in that.

Of his poems the subject matter very often is the sentimental whining of lovers. The accessories are moonlight ('the smile of the Moon', as he is fond of calling it,) chaplets of flowers, the gentle zephyr, the melody of birds ; tears from eyes that must be half-bleared by such constant action of the water works, sights from hearts that are broken for no very conceivable cause,— in short the accompaniments of sickly sentimentality and want of virile strength. Their hero is often a 'lover with a sad sonnet made to his mistress's eye-brow'; their heroine another 'airy, fairy, Lilian.

But life is not all sun shine. (I beg pardon, it should be 'moonlight'— for the sunshine here is hateful and our poets

shun it to sit piping under the banyan tree.) Life is not a flowery bed— at least is modern times. The zephyr blows for but few, and not always even for them. There are times when the black angry clouds hurry through the sky, the wind roars, and the elements are at war. Then the moon hides her face in terror; timid zephyr flies away before the rushing guests of wind; the birds are cowed into silence: the flowers are (lying?) down by the pelting shower and mingled with dust, their very ... are torn up root by root and leaf by leaf. Such tempests of the soul are entirely ignored in his poems; nay, he hardly recognises even those slow agonies which tender and modest souls patiently bear, but which kill them inch by inch. To try to render these in sentimental namby pamby verse would be a mockery. Hence it is that we hold that his poems are but light toys, pretty trifles, for the mind to sport with in its hours of idleness, but to be laid aside in its more serious moods. Hence it is, that these poems must be adjudged to have failed in giving a true rendering of life.

But such a rendering of life, esp., of modern life, has been given by Robindronath in his short stories, with a degree of success unequalled by any other of our writers. The form chosen is the most felicitious. He has naturalised the short story in Bengali with wonderful success;— he has retained all the excellent features of its (French) original, while he has added beauties which are peculiar to him. But we shall not here criticise his style,— though some of the descriptions are flawless gems, perfect prose-poems, which only a practised poetical artist could have produced,— though some of his sentences and even single phrases have a wonderful suggestiveness and dramatic effect, bringing a whole scene before the reader's eye. Our work with him is to judge him as an

interpreter of life, and to bring out the creed of which he is the preacher.

In this age of steam and electricity, society is always hurrying on. Those who cannot keep pace with its feverish haste, those who turn aside to minister pity and love, those who shrink from it selfish struggle,— in short, the meek, the tender, and the weak, are mercilessly cut off by it as useless encumbrances. These are stigmatised by it as failures in life: these are its victims. To be tender is a crime in its eyes. In the hard jostling for material gain, the tender and the unassuming are shoved to one side, or thrown down and trodden to death.

In this world we see many 'Wee modest crimsontipped flowers' blooming in the by-ways and nooks of life. They ask not for its praise, they fight not for its prises, they seek not to leave their obscure homes for the high places of the world. They only want to be let alone, they only crave a little love. Guided solely by the healthiness of nature, they take a simple unreasoning delight in the joys of life; they sport in its sun-shine, they follow their hearts' promptings untroubled by thought. There are many among them with the souls no more serious than the little squirrels that frisk on the ground and at the least alarm timidly run up the tree; only these squirrels cannot fly to a refuge, but have to bear to the full the tender mercies of human beasts of prey.

But society marches with iron heals, trampling under foot the flowers by the way-side. It cannot appreciate them: it will not even leave them unmolested. Society will not let them life their innocent lives. Society will crush their naturalness and force them to bow to its conventions. Society

looks upon their healthy joy in life as a sin.

In these short stories our author has set forth some varieties of the sufferings of the new life. First comes the 'irrepressible' daughter in law (story No. 2) and how saddening is the truth put before us here ! In the old life daughters-in-law were occasionally beaten by furious mothers-in-law. But what did they suffer compared with some of their modern sisters,— slowly killed by loveless neglect and cut to the quick by the sharp taunts and cross looks of heartless money loving mothers-in-law ? Passing by the femme incomprise and the homesick boy, (stories 7 and 10,) we next have hearts, that cling to each other, that do harm to nobody but only want to make each other happy. But the world here interposes and rudely parts them, (stories 3, 6, 15, &c.)

These sufferings of the new life can have three possible results for their victims :— (i) some die ; unable to ...... down and are trodden in the press. (ii) In others the better self dies ; naturalness and healthiness are bent to conform to conventionality. Such probably was the fate of Uma (story No. 7,) probably she lived to be

"Old and formal, fitted to her petty part,

With a heard of wordly maxims preaching down a daughter-in-law' heart."

(iii) Others struggle on to a higher life through suffering : purified and tempered by passing through the fire. But such precious souls are rare, esp., in Bengal.

Our author is nothing if not an aesthetic artist. His view of 'art' seems to be that of Swinburne, namely, that 'art' has nothing to do with morality, and that to append a moral to any work only mars its beauty. Still, we venture to think that one has not to go very far before he can glean some teaching

from these tales. For, the True (i.e., the truly Beautiful) is Good too ; and such a true rendering of life cannot in nature fail to carry its moral with it.

The teaching of our author, if we mistake not, is :— Live and let live. Crush not the innocent freedom of nature. Let the little modest flowers of the world bloom unmolested ; —they do you no harm, but they add to the beauty of God's glorious creation. Let our little squirrels frisk on ; let our butterflies

"Flutter through life little day
In Nature's varying colours' breast"

Let children sport in the sunshine. For, these and the like of them bring the light and sweetness of paradise to our dismal earth. But when you see one of these lying unhappy, tenderly nurse it, give it love, and it will recover. Touch them with a gentle hand and a gentler heart ... Speak to them in their own language. Shield them from the ... its bitterness, its sorrows, and its corrupting influences.

Jadunath Sarkar

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে (অষ্টম অধ্যায়) বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে মন্তব্য

...V (c)

57. We are now able again to turn to a brighter side of the picture and to dwell upon the work of two schools of exceptional interest which (if such influence as theirs should extend widely through the Presidency) would encourage sanguine hopes for the future of secondary education in Bengal.

58. The school founded by Sir Rabindranath Tagore at Bolpur in the western part of the Presidency is widely famous both in India and in the West. It is a boarding school for boys ; situated on a rolling upland in open country, and combining, in its course of training and methods of discipline, Indian tradition with ideas from the West. With regard to the general work of the school it must suffice to say that it is no small privilege for boys to receive lessons in their vernacular from one of the most accomplished and celebrated writers of the age. No one who has seen the poet, sitting bare-headed in a long robe in the open veranda of a low-roofed house— the wide hedgeless fields stretching to the distant horizon beyond— with a class of little boys, each on his carpet, in a circle before him on the ground, can ever forget the impression, or be insensible to the service which Sir Rabindranath Tagore renders to his country by offering to the younger generation the best that he has to give.

59. It is Sir Rabindranath's strong conviction that, while

English should be skilfully and thoroughly taught as a second language, the chief medium of instruction in schools (and even in colleges upto the stage of the university degree) should be the mother tongue. He has four reasons for this belief ; first, because it is through his mother tongue that every man learns the deepest lessons of life ; second, because some of those pupils who have a just claim to higher education cannot master the English language ; third, because many of those who do acquire English fail to achieve true proficiency in it and yet, in the attempt to learn a language so difficult to a Bengali, spend too large a part of the energy which is indispensable to the growth of the power of independent thought and observation ; and, fourth, because a training conducted chiefly through the mother tongue would lighten the load of education for girls, whose deeper culture is of high importance to India. He holds that the essential things in the culture of the West should be conveyed to the whole Bengali people by means of a widely diffused education, but that this can only be done through a wider use of the vernacular in schools. Education should aim at developing the characteristic gifts of the people, especially its love of recited poetry and of the spoken tale, its talent for music, its (too neglected) aptitude for expression through the work of the hand, its powers of imagination, is quickness of emotional response. At the same time, education should endeavour to correct the defects of the national temperament, to supply what is wanting in it, to fortify what is weak, and not least to give training in the habit of steady co-operation with others, in the alert use of opportunities for social betterment, in the practice of methods of organisation for the collective goods. For these reasons, in his own school at Bolpur he gives the central place to studies which can best

be pursued in the mother tongue ; makes full educational use of music ("music is in the air here, though at first the boys did not care for it") and of dramatic representation ('boys are wonderful actors'), of imagination in narrative and of mannual work ; of social service among less fortunate neighbours and of responsible self-government in the life of the school-community itself. For the achievement of these aims he feels that, if the right place is found for it, there is strong need for British influence in Indian education. And he speaks with gratitude of the help which he has had from English teachers in his own school, but he would refuse such help at all costs, as being educationally harmful, where lack of sympathy prevented a true human relation between the English teacher and his Bengali pupils.

60. At Bolpur there are 160 boys, ranging in age from six to over sixteen years. The staff consists of twenty-two masters, or one to every eight boys. In all but the two highest classes of the school the greater part of the teaching— three-quarters of the whole— is given through the vernacular. The boys all learn history, geography and natural science during the greater part of their school course. The younger boys have regular class teaching in music and in drawing. Sir Rabindranath has found it necessary to form at the top of the school two classes, each of one year, preparatory to the university matriculation. It is in the higher of these two classes that the anxiety of the boys begins. They feel that they are face to face with a serious thing in their lives. For most of them their future career will depend on their passing the examination. But the course of study in the classes below these two upper classes represents more fully Sir Rabindranath Tagore's ideal in education.

61. The following table shows the arrangement of the work in the class just below the stage at which the boys begin their preparation for the university matriculation examination.

Bolpur School— Class below the two preparatory for matriculation.

Number of pupils in the class...	16 (one being a girl).
Average age...	14 years.
Length of each lesson-period...	45 (or 40) minutes.

	Lesson-periods per week.
Mother tongue (Bengali)	6
English	12
*Sanskrit	6
* Mathematics	12
* History	3
* Geography	3
* Natural science	6
Aggregate for the week of $5^3/_4$ hours a day.	48

In this class there are generally no out-of-school task set, all the work being done in class.

In addition, there is for all the younger boys—

Music	three periods a week.
Drawing	three periods a week.

* These subjects, as well as the vernacular, are taught through Bengali.

62. In the class above this, the boys drop natural science and geography in view of the special requirements of the university matriculation examination. At this stage, there are no compulsory drawing or music lessons. The time given to mathematics and Sanskrit is greatly increased. And there are tasks to be done out of class hours.

Bolpur School	*Preparatory class*	*Matriculation class.*
Subject	Number of boys in the class ... 16 Average age about 15	Number of boys in the class ... 17 Average age about 16
	Number of lesson-periods per week.	Number of lesson-periods Per week.
Mother tongue . .	6	6
English .	12	12
Sanskrit ...	9 (or, for additional Sanskrit 12).	9
Mathematics ...	12	12 (or, for additional mathematics, 18).
History ..	6	6
Weekly aggregate of lesson periods	45 (or 48)	45 (or 51)

The first four subjects in this list are compulsory for all the boys in the class.

Most of the boys take 'additional mathematics' and history as their other subjects for the matriculation examination. Others take history and additional Sanskrit or additional mathematics and Sanskrit.

Each lesson-period is 45 (or 40) minutes. Natural science and geography are dropped at this stage. In these classes there are no compulsory drawing or (compulsory) music lessons

Private tasks are done out of class.

63. Four members of the staff of Bolpur school—Mr. Jagadananda Roy (Mathematics), Mr. Santosh C. Majumdar (Natural Science), Mr. Promoda Ranjan Ghosh (English) and Mr. Nepal Chandra Roy (History) favoured us with the following expression of their views on points immediately affecting the connexion between high school and the University. In these views, Sir Rabindranath Tagore concurs—

(a) Geography, and Indian (with an outline of English) history should be compulsory subjects in the matriculation examination.

(b) A little mensuration should be introduced into the paper in geometry and, if possible, a little surveying as giving practical application to the subject.

(c) It is desirable that every boy should learn some natural science at school. But the examination test would not be the surest guarantee that his interest in science had been intelligently cultivated and trained. And it would be impossible for most schools to provide expensive laboratories, apparatus and materials. If, however, (so far as those branches of science are concerned) a general elementary training in physics and chemistry was all that would be required, this instruction could be given with simple apparatus in two lesson-

periods a week. A certificate of the boy's having received this instruction might be required from his school authorities as a condition preliminary to his being allowed to enter for the matriculation examination. Moreover, for the compulsory paper in geography some study of scientific matters should be required.

(d) The boys from Bolpur are entered for the university matriculation examination as 'private students'. Sir Rabindranath Tagore and the members of his staff feel that it is important that this right should be retained. Bolpur School, wishing to work out its own methods, has not applied to the University for recognition.

64. The staff would like it to be possible for boys to take direct from Bolpur School the intermediate arts examination and (if good laboratories could be secured) the intermediate science examination. Work carried up to the intermediate stage would, in their opinion, complete the course appropriate to such a school.

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত পত্র

'জীবনকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৪ — ১৯১৯

১
৯ মার্চ [১৯০০]

৬ উইলিয়ামস লেন
হ্যারিসন রোড পোঃ আঃ
২৬শে ফাল্গুন [১৩০৬]

যথোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি[১] পত্রিকার কলেবরভুক্ত করিবার জন্য যথাসময়ে পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। প্রবন্ধটি অন্যকে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিবে কি না জানি না, কিন্তু কবির কল্পনা-শক্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যাপারে কতটা কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপে সমাজদারের নিকট গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

বৈশাখের পত্রিকার জন্য আর একটি প্রবন্ধের ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আশা করি বঞ্চিত হইব না। বৈশাখের পত্রিকা যন্ত্রস্থ।

আপনি নিরবচ্ছেদে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকিলে আমাদের সাহিত্যসমাজের জড়তায় কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে আশা করি। আপনার প্রবন্ধে উৎসাহিত হইয়া আমার একটি ইংরাজিনবীশ অধ্যাপক বন্ধু[২] ইংরাজি ও বাঙ্গালা ইডিয়মের তুলনা করিয়া একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন; তাঁহার আর একটি প্রবন্ধ পূর্ব্বেই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

আপনি কতদিনে কলিকাতায় আসিবেন? পত্রোত্তরে কুশল সংবাদে সুখী হইব।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২

৩ এপ্রিল ১৯০০

৬ উইলিয়ামস লেন

২১শে চৈত্র ১৩০৬

যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার কাহিনী[১] উপহার পাইয়াছি এবং বলা বাহুল্য আগাগোড়া পড়িয়াছি। আপনার কবিতায় আমি বাল্যাবধি মুগ্ধ, সুতরাং আমার বলিবার কথা কিছুই নাই। 'গান্ধারীর আবেদন'[২] পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এবার পড়িয়াও আনন্দের মাত্রা কমিল না। আমাদের পুরাতন মহাকাব্যের জীবন্ত রক্তমাংসময় চরিত্রগুলিকে আরও সতেজ ও আরও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র[৩] শেষাংশ খবরের কাগজে উদ্ধৃত দেখিয়া তাহার পাঠে যে নূতন আনন্দরসের আস্বাদন পাইয়াছিলাম, 'ভাষা ও ছন্দে'[৪] সেই রস আরও ঘনীভূত ও গাঢ় ভাবে আস্বাদন করিলাম। অমাবাইয়ের ঐতিহাসিক কথা[৫] ও সোমকের পৌরাণিক কথা[৬]

আমাদের বর্তমান কালের অবস্থায় পথ্য স্বরূপ হইয়াছে বলিলে বোধ হয় আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা কবির প্রতিভা নৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বদ্ধ থাকিতে চায় না ও কালাকালের অপেক্ষা করে না, কিন্তু তথাপি কাহিনীর এই অংশ এবং পূর্ব্বপ্রকাশিত 'কথা'র কথাগুলি আমাদের কঙ্কালবর্জ্জিত শরীরে অস্থিগঠনে সহায়তা করিবে বলিয়া আমি কতকটা আশা করি। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'[৭] অন্য কাহিনীগুলির সহিত নিশ্চয় যুক্ত হয় নাই ; স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাহির হইলে মন্দ হইত না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার মাঝে মাঝে তীক্ষ্ম শর প্রয়োগ দেখিয়া আমি অনেক সময় ব্যথা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একবার সাধনায় প্রকাশিত জাবালি সত্যকাম সংবাদ[৮] পড়িয়া সে দুঃখ গিয়াছিল ; এবার 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'[৯] তাহা অন্তর্হিত হইল, কর্ণ চরিত্রের মাহাত্ম্য যিনি এরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কর্ণচরিত্রের সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভূত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

লিখিবার কিছু নাই বলিয়া ক্ষুদ্র একটা সমালোচনা করিয়া ফেলিলাম, তজ্জন্য প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন। এই মার্জ্জনা ভিক্ষার পর আর একটি ভিক্ষা আছে। পরিষৎ পত্রিকার বৈশাখের সংখ্যার[১০] জন্য একটি প্রবন্ধ ; ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ হইলেই ভাল হয়। কোন পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। ভবিষ্যতে এই দি[কে ব]লিতে আমার ইচ্ছা আছে, এবং বর্ষারম্ভে আপনার হাত হইতে এই কার্য্যের সূচনা হয় এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি ১০/১২ দিনের মধে[্য প্র]বন্ধ একটি পাঠান সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমার বাড়ীর ঠিকানায় জেমো

কান্দিতে পাঠাইবেন। প্লেগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব আমি সপ্তাহমধ্যে বাড়ী যাইবার চেষ্টায় আছি।

আপনার কুশল সংবাদে সুখী হইব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩

১৭ পৌষ ১৩০৭

৬ উইলিযামস লেন

১লা জানুয়ারি ১৯০১

প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন,

নূতন শতাব্দীর প্রথম দিবসে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আপনাকে সম্ভাষণ করিতে পারিলাম না। পত্র দ্বারাই আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। গত শতাব্দীর শেষপাদ ব্যাপিয়া আপনার লেখনী মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার দীনতামোচনে নিরত রহিয়াছে, আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিবিধ উপহার মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়াছে। এই "শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা শুধু মিছে কথা ছলনা'র' দিনে আপনি জননীর লাজ ঘুচাইবার জন্য অকৃত্রিম অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আপনার বন্ধুগণের অকপট হৃদয়ের প্রার্থনা যে আরও অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনি মাতৃসেবায় নিযুক্ত থাকুন। বঙ্গসাহিত্য আপনার রচিত বিবিধ পুষ্পের মালা পরিয়া অলঙ্কৃত হউক।

অবিরাম সপ্তাহ কাল জ্বর ভোগের পর কাল আমার জ্বর ত্যাগ হইয়াছে। চারি পাঁচ দিন মধ্যে বাটীর বাহির হইতে পারিব ভরসা করি না। আপনি কলিকাতায় আর কতদিন আছেন জানিতে ইচ্ছা করি।

সঙ্গীত সমাজে বিসর্জ্জনের প্রথম অভিনয়[১] দেখিয়া বিস্ময় ও তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলাম; শরীরের অসুস্থতায় সমাজের দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাগুলি[২] নকলের পর এখন কি অবস্থায় কাহার কাছে আছে? আপনি একবার দেখিয়া প্রকাশের পৌর্ব্বাপর্য্যটা স্থির করিয়া দিলে ভাল হয়। আমার বিবেচনায় বাল্যকালের রচনাগুলি প্রথমে পৃথক রূপে বাহির করিয়া পরবর্ত্তী রচনাগুলি বিষয় অনুসারে সাজাইলে চলিতে পারে। যত শীঘ্র পারি সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব।

আগামী সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকার জন্য আপনার একটি প্রবন্ধ প্রার্থনীয়। পত্রিকার এই সংখ্যা যন্ত্রস্থ। যথাসম্ভব সত্বর প্রবন্ধটি পাইলে অনুগৃহীত হইব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

পুঃ নিঃ। ত্রিপুরা মহারাজের নিকট পরিষদের আবেদন[৩] প্রেরণের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি?

৪
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০

৮ মধুসূদন গুপ্ত লেন
২৯ ভাদ্র ১৩১৭

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্রের মর্ম্ম কুমার শরৎকুমারকে[১] জানাইলাম। কোনরূপ একটি তালিকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে পুঁথির নকল আনা সুবিধা হইবে না। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তালিকা আছে কি না জানি না; সংবাদ পাইবার চেষ্টায় থাকিলাম। কুমার শরৎকুমারের উদ্যম এখন যেরূপ জ্বলন্ত অবস্থায় আছে, তাহাতে ইন্ধন যোগান আবশ্যক; নতুবা স্বভাবত নিবিয়া যাইতে পারে। দুই চারিখানা নূতনপুঁথি কোনরূপে সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার উৎসাহ বজায় থাকিবে।

আমার সম্বন্ধে সংবাদ চাহিয়াছেন— নূতন বার্ত্তা এই যে দেহযন্ত্রকে চিনির কারখানায় পরিণত করিয়াছি— প্রতি আউন্স জলে ১৫ গ্রেন চিনি মিশাইতে সমর্থ হইয়াছি।

সম্প্রতি শশিপদবাবুর দেবালয়ের[২] সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, প্রবন্ধের উৎকট নাম দিয়াও ফেলিয়াছি— 'বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা'— কিন্তু কাগজ কলম হাতে লইয়া কি লিখিব স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা বলিবার ছিল, সব শেষ করিয়াছি —আর কিছু বক্তব্য নাই— এই মনে হইতেছে।

আপনি কলিকাতায় কখন আসেন, কখন চলিয়া যান, জানিতে পারি না; ধরিবার সুযোগও পাই না। পূজার পূর্ব্বে আসিবার সম্ভাবনা

আছে কি? তাহা হইলে প্রবন্ধ পাঠের দিনটা তদনুসারে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারি। এখন ২৪শে সেপ্টেম্বর পড়িবার দিন স্থির আছে।

শ্রীমান রথীন্দ্রের অনুবাদিত বুদ্ধ চরিতের[৩] কেবলই কি বিজ্ঞাপন বাহির করিতে থাকিবে ? উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন না কি ? রায়বাহাদুর শরৎ দাস[৪] দ্বারা অবদান কল্পলতার তর্জ্জমা আরম্ভ করাইয়াছি— ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধ চরিতটাও বাহির হইয়া গেলে ভাল হয়। শ্রীমানকে কি কেবল জমিদারিতেই মগ্ন রাখিবেন ?

সাহিত্য পরিষদের যতদিন পাকা বাড়ি[৫] ও অর্থসামর্থ্য ছিল না, ততদিন কাজ করিবার লোক জুটিত না। নিষ্করুণ ভাবে অপরের অর্থ দোহন করিয়া জিনিষটা যেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, অমনি এত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত কর্ম্মকর্ত্তা জুটিতেছেন যে, বুঝি তাঁহাদের রেষারেষিতেই পরিষৎ ভাঙিয়া পড়েন। জীবদ্দশাতেই পরিষদের সমাধি দেখিয়া যাইব কি না উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়াছে।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৫

১৬ নভেম্বর ১৯১৩

১২ পার্সীবাগান লেন, কলিকাতা

৩০ কার্ত্তিক, ১৩২০

সুহৃদ্বরেষু,—

আজ ইউরোপ আপনার জয়ডঙ্কা[১] বাজাইয়াছে ও অবশেষে সোনার মুকুটের অলঙ্কার পরাইয়াছে, তাই শুনিয়া ও দেখিয়া

আপনার নিকট আনন্দ প্রকাশে, লজ্জা ও সঙ্কোচ হইতেছে। সেই আত্মাবমাননায় আমি প্রস্তুত নহি, বিধাতৃ-বিধানে আপনার যাহা প্রাপ্য, আপনি তাহা পাইয়াছেন— উহাতে আপনার স্বোপৰ্জ্জিত স্বত্ব আছে— উহা কোনোরূপ উপরিপাওনা নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ এতদিন যে অধিকারে বঞ্চিত ছিল, আপনাকে আশ্রয় করিয়া ও উপলক্ষ করিয়া, আজ তাহা আদায় করিল, এবং আমরা ভারতবাসী অংশতঃ তাহার ফললাভ করিলাম, তজ্জন্য আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। সেই আনন্দপ্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। অনেকে বলিতেছেন, স্বদেশ যাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, বিদেশ তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, ইহা স্বদেশের ধিক্কারের কথা। আমি তাহা স্বীকার করি না। স্বদেশের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহার নিজেকে চিনিবার সম্পূর্ণ শক্তি নাই ; যাহারা আপনার, তাহাদিগকে চিনিবারও শক্তি নাই ; যে শক্তিটুকু আছে, তাহার সম্যক্ প্রকাশেরও ক্ষমতা নাই। কালি যদি আমার দেশ গলা খুলিয়া বলিতে যাইত, আমার এই ভাঙা ঘরের দেওয়ালের ভিতর এমন প্রদীপ গুপ্ত আছে, যাহা জগতে আলো দিতে পারে, তাহা হইলে আমার দেশকে কিরূপ বিদ্রূপ ও অপমান সহিতে হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আজ যখন সেই জীর্ণ প্রাচীর ভিন্ন করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ রবিজ্যোতিঃ আপনা হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই আলোতে সেই ভাঙা ঘরও প্রকাশ পাইয়াছে আজ সেই কুটীরবাসীদের আনন্দপ্রকাশের অবসর উপস্থিত। আজি আমরা অকুণ্ঠিত ভাবে জয়ধ্বনি দিব। আপনার জয় নহে— আপনার 'সোনার বাংলা'র জয়— আপনার 'ভুবনমনোমোহিনী'র জয়। বিধাতার হাতে আপনি যন্ত্রমাত্র— আপনাকে দিয়া বিধাতা এতকালের

এই অবমানিত জাতিকে জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, আজি বিধাতার জয়। আপনার নিকট ঋণ প্রকাশের আজি অবসর নাই—সামাজিকতা লৌকিকতার নিয়মরক্ষার এখন সময় নাই। ভবিষ্যতের আশায় আজি প্রাণ উৎফুল্ল হইয়াছে। সেইজন্য আনন্দ করিব।

আপনি বহুবার আমাকে চিঠি লিখিবার সময় "সুহৃদ্বরেষু" এই পাঠে সম্বোধন করিয়াছেন ; আমি প্রত্যুত্তরে ঐ পাঠ ব্যবহারে সাহসী হই নাই, আজি তাহা ব্যবহারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৬

১৪ এপ্রিল ১৯১৪

৮ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট

১লা বৈশাখ ১৩২১

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

নববর্ষারম্ভে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন।

কালনার ঘটনায়[১] দুর্ব্বল স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায় জড়পদার্থ হইয়া বসিয়া আছি। এ ধাক্কার বেগ সমালাইতে কিছু দিন যাইবে।

আমার দত্ত সেই বালকটির[২] জন্য আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। কয়েকমাস পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্রকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম, তখন স্থানাভাবে কোন সুবিধা হয় নাই। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্র আমাকে পতিসর হইতে লিখিয়াছে,— সেখানে নূতন পদ খালি হইয়াছে। এখন তাহার প্রতি আপনার অনুগ্রহ দৃষ্টি প্রার্থনীয়। ব্রজেন্দ্রের চিঠিখানি এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আমার কর্ম্মকথাখানির[৩] পাতা উল্টাইয়াছেন কি? শেষের প্রবন্ধটি ('যজ্ঞ') কোনও পত্রিকায় বাহির হয় নাই। অন্ততঃ ঐ প্রবন্ধটি একবার পড়িতে অনুরোধ করি। কর্ম্মকথায় প্রায় সমুদয় প্রবন্ধ naturalist ও evolutionist-এর তরফ হইতে লিখিয়াছি। যজ্ঞ প্রবন্ধটিতে একটু নূতন পথে চলিতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত naturalism-এ কুলায় না দেখিয়া অন্য পথ আশ্রয় করিতে হইয়াছে। কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিচার করিবেন।

আমি আমার ঠিকানা বদলাইয়াছি। উপরে দেখিবেন।

১৩২০ সালটা পার করিলাম। কালনায় 'অঙ্গার অবশেষ' হইয়া গঙ্গাবারিস্পর্শে সদ্য চতুর্ভুজ বেশ প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাহা যখন নিতান্তই ঘটিল না, তখন আরও কিছু দিন দৌরাত্ম্য করিব।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৭
২৫ নভেম্বর ১৯১৪

৮ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট্
হ্যারিসন রো্ড ডাকঘর
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩২১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণ[১] আজিকার ডাকে পাঠাইলাম; একবার পাতা উলটাইবেন; কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ ইহাতে দিয়াছি; পঞ্চভূত, অতিপ্রাকৃত, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল পূজা। সাহিত্য পরিষদে মায়াপুরীটা পড়িয়াছিলাম, সেদিন আপনি উপস্থিত ছিলেন; আপনার সম্মুখে প্রবন্ধ পাঠের ভাগ্য আমার বড় একটা জোটে না, সেই একদিন জুটিয়াছিল।

৫ই ভাদ্র সন্ধ্যার পর[২] আপনার দত্ত পুরস্কার মাথায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়াই শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম; সমস্ত ভাদ্রটাই শয্যাগত ছিলাম। আশ্বিন ও কার্ত্তিকের অর্দ্ধেক বাড়ীতে গিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিয়াছি; আবার কিছু দিন চলিবে। এইরূপে ঠেকো দিয়া যতদিন চলে চলুক।

সবুজ পত্রের সম্পাদক[৩] আমাকে একদিন আশা দিয়া গিয়াছিলেন, সবুজ পত্রে আমার 'কর্ম্মকথা'র আলোচনা করিবেন। তাঁহার হাতের আলোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। সমালোচনাটা সম্মার্জ্জনার কাজ করিলেও আহ্লাদের সহিত পিঠ পাতিয়া দিব। আপনি একবার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন কি?

কর্ম্মকথার স্থানে স্থানে হিন্দুর সমাজতন্ত্রের প্রতি এক আধটু পক্ষপাতের কথা আছে— কিন্তু ওগুলা নিতান্তই অবান্তর কথা— প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কর্ম্মকথার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন

—মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিটা স্বভাবের নিয়মে— বাহির হইতে ঘাত প্রতিঘাতে— মানবসমাজে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে— কতটা গজাইতে পারে, অধিকাংশ প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। Natural selectionকে নিংড়াইয়া কতটা ধর্ম্ম-রস আদায় করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে Evolution-তন্ত্রীরা যে পথে Ethics শাস্ত্র গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমি দেখাইয়াছি। Evolution হইতে সবটুকু পাওয়া যায় না। কর্ম্মকথার শেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ'— এই প্রবন্ধটিতে আমি একটু নূতন পথে গিয়াছি। আপনি কর্ম্মকথা পড়িয়াছেন কি না জানি না— যজ্ঞ প্রবন্ধটি একবার সময়মত পড়িবেন কি? এই প্রবন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছি কি না তাহা কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম না।

ইতিমধ্যে আপনার কলিকাতা আসার কোন সম্ভাবনা আছে কি?

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৮

৭ জানুয়ারি ১৯১৯

২৩শে পৌষ ১৩২৫

৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

কাল আমার কন্যা[১] ২৭ বৎসর বয়সে ছয় মাস রোগ ভোগের পর কোথায় চলিয়া গিয়াছে— ছয় মাস কি সে আসুরিক যাতনা

সহিয়াছে, তাহা কি লিখিব। পাষাণের মত বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি —এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন প্রতিকার বা উপশম করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপারের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি— নগ্ন মূর্ত্তি মরণের[১] সম্মুখে প্রণাম করিয়াছি। পরম কারুণিকের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া যে শান্তি, সে শান্তি লাভে আমি বঞ্চিত। চলিত ভাষায় আমি নাস্তিক। সে কথা তুলিয়া আমাকে প্রবোধ দিবেন না। নিজস্ব মরমের ব্যথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নাই— কিন্তু আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনি নিজে দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন— জগৎবিধানের অত্যাচারে বিশ্ব ব্যাপিয়া যে করুণ রোদন উঠিতেছে[৩], আপনার হৃদয়ের তার তাহাতে যেমন ঝঙ্কার দিয়াছে আর কাহারও সামর্থ্যে তাহা সম্ভব হয় নাই। নরদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার সমবেদনায় কখনও আমার বিশ্বাস নাই— বাল্যকালে যেদিন হইতে আপনার কবিতার আস্বাদন পাইয়াছি, আপনাতে নরদেবতার আবির্ভাব দেখিয়া নির্বাকভাবে আপনাকে পূজা করিয়া আসিতেছি। অপিচ আমার ভাগ্য যে আমি আপনাকে জানি— এবং আপনিও হয়ত আমাকে জানেন। অতএব নিঃসঙ্কোচে আপনাকে এই ব্যথা জানাইলাম। আপনি একটা উষ্ণ শ্বাস ফেলিবেন— তাহাতেই আমার পক্ষে যতটা সম্ভব শান্তি লাভ ঘটিবে।

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

‘রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা

আমার শরীর ভাল নাই, আমার অবকাশও অল্প। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে মনের মত করিয়া কিছু লিখিব এমন সুযোগ এখন আমার নাই। শুধু শ্রদ্ধা নহে, তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি সুগভীর ছিল, এ কথা আমি পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এ কথা বলিবার লোক আরও অনেক আছে। যে কেহ তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, সকলেই তাঁহার মনীষায় বিস্মিত ও সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধির, জ্ঞানের, চরিত্রের ও উদারহৃদয়তার এরূপ সমাবেশ দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁহার যে অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার ঔদার্যের একটি অসামান্য প্রমাণ। আমার সহিত তাঁহার সামাজিক মতের ও ব্যবহারের অনৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার চিত্তকে আমার প্রতি বিমুখ করিতে পারে নাই; এমন কি প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে একদা আমার প্রশস্তিসভার আয়োজন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

বাংলার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে সাধারণত লিপিনৈপুণ্যের অভাব দেখা যায় না; কিন্তু স্বাধীন মননশক্তির সাহস ও ঐশ্বর্য অত্যন্ত বিরল। মনন ও রচনারীতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সেই খ্যাতি বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যা তাঁহার ছিল প্রভূত, কিন্তু সেই বিদ্যা তাঁহার মনকে চাপা দিতে পারে নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার বিষয়বিচারে অথবা তাহার লেখন-প্রণালীতে অন্য কাহারও অনুবৃত্তি ছিল না।

দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস তোতাপাখী কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধিবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সংহত হইয়াছিল।

জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁহাকে বারম্বার মর্মাহত করিয়াছে। তিনি যে সকল ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে পালন করিতেছিলেন তাহাতেও নানাপ্রকার বাধাবিরুদ্ধতা তাঁহাকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অজস্র মাধুর্য-সম্পদের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই— রোগ তাপ প্রতিকূলতার মধ্যে তাঁহার প্রসন্নতা অম্লান ছিল। বিরোধের আঘাত তাঁহাকে গভীর করিয়া বাজিত, অন্যায় তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিত। কিন্তু তিনি ক্ষমা করিতে জানিতেন। সেই মাধুর্য সেই ক্ষমাই ছিল তাঁহার শক্তির প্রকাশ।

তিনি যদি কেবলমাত্র বিদ্বান্ বা গ্রন্থরচয়িতা বা স্বদেশপ্রেমিক হইতেন, তাহা হইলেও তিনি প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বভাবের যে একটি পূর্ণতা ছিল তাহারই গুণে তিনি সকলের প্রীতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন পুরস্কার অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

২৮ ফাল্গুন ১৩২৪ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী, 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা', চৈত্র ১৩৩০

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্র-যদুনাথ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের (১০ ডিসেম্বর ১৮৭০ —১৯ মে ১৯৫৮) প্রথম পরিচয় কী সূত্রে কোথায় হয়েছিল বলা যায় না। তবে যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকারের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। রাজকুমারের বাসস্থল রাজশাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে। এই গ্রাম দেবেন্দ্রনাথের পতিসর মহালের পার্শ্ববর্তী এলাকা। রাজকুমার ছিলেন রাজশাহী জমিদারসভার সম্পাদক। কলকাতায় এলে তিনি জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে রাজশাহী ব্রাহ্মসভার অন্যতম ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন।[১]

যদুনাথ ছাত্রাবস্থায় পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তখন ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল বলে জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৪তে 'সাধনা'য় ছোটোগল্প লিখছেন সেই সময়েই সদ্য এম-এ পাস, রিপন কলেজের অধ্যাপক যদুনাথ ইডেন হস্টেলের সুহৃদ সমিতির পত্রিকা. 'সুহৃদ'-এ রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখেন "The New Leaven in Bengal"। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের যোগাযোগের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় যদুনাথের একটি রচনায়। "Sister Nivedita as I knew her"[২] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের বিববণ পাওয়া যায়। এই ভ্রমণে অন্যান্য সঙ্গী

---

১ এই তথ্যের উৎস *Sir Jadunath Sarkar : A Centenary Tribute* published by the convener Sir Jadunath Centenary Meeting Committee on behalf of the Asiatic Society, Bangiya Sahitya Parishad & Calcutta Historical Society। তথ্যগুলি যদুনাথের আত্মীয় পরিজনদের থেকে সংগৃহীত।

২ *Hindusthan Standard*, Puja Annual 1952

ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ) পরবর্তী কালে স্বামী শঙ্করানন্দ নামে পরিচিত ব্রহ্মচারী অমূল্য। যদুনাথ তখন পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেখান থেকে তাঁদের ভ্রমণের সঙ্গী হবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কার পরামর্শে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সম্ভবত যদুনাথকে নেওয়ার কথা জগদীশচন্দ্রই বলেন। পাটনা যাওয়ার আগে যদুনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে দুই বারে কাজ করেন, সে সময় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পবিচয় হয়েছে। ছাত্র হিসাবে কৃতী, ইতিহাসে পণ্ডিত হিসেবে সদ্যপরিচিত যদুনাথকে সঙ্গে নেওয়ার কথা জগদীশচন্দ্রই ভেবে থাকবেন। যদুনাথের প্রথম বই *India of Aurangzib* ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়, সে বই রবীন্দ্রনাথ দেখে থাকবেন। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণকারীদের সঙ্গে যদুনাথ পাটনা থেকে যোগ দিয়েছিলেন।

যদুনাথ তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জানিয়েছেন, তাঁরা মোহান্তের অতিথিশালায় থাকতেন। প্রতিদিনি ওয়ারেনের *Buddhism in Translation* এবং এডুইন আরনল্ডের *Light of Asia* থেকে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো গান গাইতেন, কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। সেখানে এক জাপানি ভক্তকে তাঁরা দেখেছিলেন, তার নাম ফুজি। তিনি ছিলেন সামান্য জেলে, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের পুণ্যতীর্থে তপস্যা করবার জন্য এসেছেন। প্রতিদিনি সন্ধ্যায় বোধিবৃক্ষের ছায়ায় বসে স্তবমন্ত্র পড়তেন :

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম চন্দিমায়
নমো নমো নন্ত গুণন্নবায়
নমো নমো সাক্যনন্দনায়।

এই প্রসঙ্গে যদুনাথ লিখছেন :

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn, and when he wrote his play Natir Puja he took care to insert it as Shrimati's prayer— Fuji had given the hint.

রবীন্দ্রনাথ এই জাপানি ভক্তের কথা অন্যত্রও স্মরণ করেছেন :

'দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা কবতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি কবতে লাগল : আমি বুদ্ধেব শরণ নিলাম।'[১]

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে যদুনাথ বুদ্ধগয়ায় কাটানোর ফলে দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল— এ বন্ধুত্ব ববীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যদিও মাঝে দু-একবাব সংশয়েব আবিলতাও দেখা গেছে। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণের পরের বছরই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে রাখী পাঠিযে দেন।

১৯০১-এর জুলাই মাস থেকে ওই বছবেব ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯২৬-এব পূর্ব পর্যন্ত যদুনাথের কর্মক্ষেত্র কলকাতা ছিল না। এর মধ্যে দু-বছর তিনি ছিলেন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৭-এর অগস্ট থেকে ১৯১৯-এর জুন পর্যন্ত। তার পরই ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল সারভিসে উন্নীত হয়ে তিনি কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে চলে যান, ১৯২৩ পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। তার পর আবার তিনি ফিরে আসেন পাটনায়। যদুনাথকে লেখা

---

১ কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ। দ্রষ্টব্য, 'বুদ্ধদেব', ১৩৬৩, পৃ ২।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি যথাযথ বোঝবার জন্য যদুনাথের স্থানপরিবর্তনগুলি মনে রাখলে ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথের ২ জুলাই ১৯২২-এর চিঠি (সংখ্যা ১৫) যদুনাথ পেয়েছিলেন দার্জিলিঙে ৬ জুন। সে-সময় থেকেই তিনি দার্জিলিঙে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ ছেড়ে তিনি ১৯২৮ থেকেই স্থায়িভাবে দার্জিলিঙে বাস করতে থাকেন।

ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুনাথের পরিচয়ের সূত্রপাত থেকেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের লেখা যদুনাথ অভিনিবেশ সহকাবে পড়তেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক; ১৯০৮ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি ইতিহাসেও অধ্যাপনা করতে থাকেন যদিও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ ১৯০১ সালেই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের তিনি ছিলেন রসিক পাঠক যদিও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী হেমচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। যখন রবীন্দ্রনাথের 'সোনাব তবী' কবিতার অর্থ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে, তখনই যদুনাথ প্রবাসীতে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন :

'রবীন্দ্রনাথের গত ১৬ বৎসরের কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে নূতন ভাব প্রচার করিতেছে। ("সোনাব তরী"কে এ ভাবেব শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বা আদর্শ মনে করা ভুল।) এই ভাবগুলি আমাদের পুবাতন-স্মৃতি-অভ্যস্ত ভাব হইতে ভিন্ন, অনেকের পক্ষেই নূতন। প্রথম পাঠেই যে এরূপ কবিতার প্রতি পংক্তি বোঝা যাইবে এরূপ আশা কবা যায় না।...

শেলী ব্রাউনিং এমার্সনও আজকাল বেশী পড়িয়া পড়িয়া অতি পুরাতনের মত সহজ বোধ হয়। আমাদের দেশের সমালোচকেরা যদি ভাব-বিকাশ তাঁহাদেব কর্তব্য বলিয়া চিনিতেন, তবে এতদিনে রবীন্দ্রনাথের নূতন

ধরণের কবিতাগুলি পাঠকসমাজে বড়ই পুরাতন হইয়া পড়িত।"[১]

পরবৎসর প্রবাসীতেই তিনি "দুই রকম কবি : হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে দুই কবির বিভিন্ন প্রকৃতি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেন।[২] হেমচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন না করেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ নিঃসংশয়রূপে বিশ্লেষণ করেন। অবশেষে বলেন 'এরূপ বর্ণনায় রবীন্দ্র অদ্বিতীয়। এর পাশে "হেম-নবীনের নাইকো জারিজুবি"। তাঁহাদের বর্ণনা যেন Conventional বোধ হয়।' এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে যদুনাথের রসগ্রাহিতা প্রকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সম্পর্কেও তাঁর গভীর রসপ্রতীতির নিদর্শন আছে। যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের গল্পেরও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর অনেক আগে ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি The New Leaven in Bengal নামে রবীন্দ্রনাথের গল্পের আলোচনাও করেন।

১৯১০-এর ফেব্রুয়াবি মাসে ভাগলপুবে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে ববীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন তাব নোট নেন যদুনাথ এবং ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁদের নোট অবলম্বনে খগেন্দ্রনাথ মিত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সংকলন করেন। প্রবাসীতে (চৈত্র ১৩১৬) সেটি প্রকাশিত হয়।[৩]

---

১ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৩

২ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৪

৩ প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৬, পৃ ৯৬৯-৭২। সংকলিত ভাষণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় প্রসঙ্গত খগেন্দ্রনাথ লেখেন 'যাঁহারা সেদিন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রবাবুর ওজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা সেই কাব্যসম্পদে অতুল, জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত বক্তৃতার এই দীন সংস্করণে প্রীত হইবেন— এ আশা আমার নাই।'

১৯১০-এ রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথের পত্রালাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই তৎকালীন সাহিত্যিক বিতর্কে যদুনাথ যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করলেন, আবার প্রায় তখন থেকেই তিনি রবীন্দ্ররচনার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি লেখেন :

'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির অনেকেরই ইংরেজী অনুবাদ করিয়া আমি Modern Review পত্রিকায় প্রকাশ করি তাহার তালিকা নীচে দিলাম। এগুলির গ্রন্থাকারে মুদ্রণ অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ বঙ্গের বাহিরের জগৎ বাঙ্গালা না জানার জন্য প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে চিনে না, ইংরেজীর ভিতর দিয়াই তাঁহার চিন্তা বিশ্বমানবের নিকট পৌঁছানো সম্ভব। লণ্ডনের একজন সাহেব প্রকাশক এইরূপ গ্রন্থের প্রকাশের ও বিক্রয়েব ভার লইতে সম্মত হইয়া আমাকে পত্র লেখেন, কিন্তু এই সময়ে আমি, চাকরীর ঝঞ্ঝাটে ও পারিবারিক শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি।'

মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের যে-সব বচনার অনুবাদ করেছিলেন[১] :

1. The Philosophy of Indian History Dec. 1910 pp. 628-32
[ভারতবর্ষের ইতিহাস]
2. Sakuntala : Its inner meaning Feb. 1911 pp. 171-75
[শকুন্তলা]
3. The Future of India March 1911 pp. 238-44
[পূর্ব ও পশ্চিম]

---

১ এই তালিকা যদুনাথেরই দেওযা। অথচ মডার্ন রিভিউর মুদ্রিত প্রবন্ধের প্রথম ও তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক হিসাবে নাম দেওয়া আছে S. D. Varma সম্ভবত যদুনাথের ছদ্মনাম।

4. The Rise and Fall of the Sikh Power	April	1911	pp. 334-38
[শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ]			
5. Impact of Europe on India	May	1911	pp. 498-502
[নূতন ও পুরাতন]			
6. The Impact of Europe in India	July	1911	pp. 93-97
[নূতন ও পুরাতন]			
7. Beauty and Self-Control	Sept.	1911	pp. 225-27
[সৌন্দর্যবোধ]			
8. The Victorians in Defeat	Dec.	1911	pp. 560-65
[জয় পবাজয়]			
9. India's Epic	Mar.	1912	pp. 237-40
[বামায়ণ]			
10. Woman's Lot in East and West	June	1912	pp. 573-79
[প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]			
11. The Supreme Night	June	1912	pp. 579-83
[একরাত্রি]			
12. Adamant	Dec.	1912	pp. 571-73
[মহামায়া]			
13. The River Stairs	Oct.	1912	pp. 340-45
[ঘাটেব কথা]			
14. The Springhead of Indian Civilization	Dec.	1912	pp. 563-67
[তপোবন]			
15. Communal Life in India	June	1913	pp. 655-61
[স্বদেশী সমাজ]			

16. My Interpretation of Indian History	Aug.	1913	pp. 113-18
[ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা]			
17. Kalidas, the moralist	Oct.	1913	pp. 347-49
[কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা]			
18. Tagore's Ballads	Apr.	1913	pp. 381
Poems : His Vow [পণরক্ষা]			
The Voteress [পূজারিনী]			

১৯১৯-এর ১২ এপ্রিল সি. এফ. অ্যান্ডরুজ যদুনাথকে এই অনুবাদগুলি বিলাতের পুস্তক প্রকাশককে দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। অ্যান্ডরুজের চিঠি উদধৃত হল :

Santiniketan
Ap. 12. 1919

My dear Jodu Babu,

I have been very much impressed (on going through the file of the old Modern Review) with your translation from Gurudev's Bengali works and their permanent value both for English and for Indian readers if collected and revised.

If you were able to do this collection and revision [in] this hot weather and make them up into a complete book— with possibly one or two important new translation such as Gurudev might suggest— I should be most glad to assist you in any way I could by suggestions as to the needs of the English reader in England and also to recommend strongly Macmillan to publish the book if you could wish it.

I have spoken very strongly about this to Gurudev and he is very pleased with the suggestion. More and more in England there is the demand for more accurate knowledge of

India and I feel certain that the book would take. The Oxford University Press has shown how great the demand is by its publication of 'histories' and different series.

Could you write to me your opinion on the matter?

Yours very sincerely
C. F. Andrews.

যে-সময় যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ করছেন, সেই সময়ে তিনি মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন আসতেন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের কাছে ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা করতেন।[১] ২-সংখ্যক পত্র ও তার টীকা দ্রষ্টব্য। যদুনাথ শান্তিনিকেতন শিক্ষাশ্রমের আদর্শেব অনুবাগী ছিলেন তার প্রমাণ তিনি বিখ্যাত মারাঠি ঐতিহাসিক-বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামকান্তকে ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতনে যোগ দিতে প্রণোদিত করেছিলেন। শ্যামকান্ত তিন বৎসব এখানে পড়াশুনা করে ১৯১৬তে ম্যাট্রিক পাস করে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি যদুনাথ যে অনুরক্ত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর সেকালে মডার্ন বিভিউতে প্রকাশিত প্রবন্ধেও আছে। ১৯১৮ সালে 'The Vernacular Medium : Views of an Old Teacher" নামে প্রবন্ধে প্রসঙ্গত যদুনাথ লেখেন :

The other party, whose chief exponent was the poet Rabindranath Tagore, held that by tecahing Mathematics, History, Science and Geography in our Mother tongue we can not only secure greater thoroughness but also effect a reduction of the time so saved may be used in giving the boys a more thorough

---

১ শান্তিনিকেতনের শিক্ষক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েব 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' (পৌষ ১৩১৯)-এর ভূমিকা এ-সময়েই লেখেন।

knowledge of English. Thus according to him the vernacular medium would ensure a deeper knowledge of things and of the English language also at the same time.[১]

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের গভীর সৌহার্দ্যের ফলে যদুনাথ যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও আদর্শের ব্যাখ্যাতা হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও যদুনাথের বিচারবোধ ও মননশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন। ১৩১৮ (অর্থাৎ ১৯১১)-তে প্রবাসীতে আষাঢ় সংখ্যায় 'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হয়। তার প্রথম পাতার পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ নাটকটি যদুনাথকেই 'আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ' উৎসর্গ করেছিলেন।

পরবৎসর গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এই উৎসর্গটি ছিল না। না থাকার কারণ অবশ্যই মনোন্তব নয়। কারণ অন্তত ১৯২২-এব পূর্ব পর্যন্ত এর কোনো প্রমাণ নেই ববং ১৯২১-এ বিদেশ থেকে ফিরে এসেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী পরিকল্পনা নিয়ে যদুনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে ব্যাকুল হয়েছেন দেখতে পাই। ১৯১৮তে স্যাডলার কমিশনের প্রশ্নের উত্তর যদুনাথের সঙ্গে পরামর্শ করেই লিখতে চান, তাও দেখা যায়।

দুজনের এই অব্যাহত সৌহার্দ্য আকস্মিক ভাবেই বাধাগ্রস্ত হয় বিশ্বভারতীব বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাব প্রাক্‌কালে। এ বিষয়ে ১৫-সংখ্যক পত্র এবং তার টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯২৬ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯২৮-এর ৭ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকার সম্পর্কে কিছু অনুযোগ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চিঠি লেখেন। তিনি বলেন:

---

১ *Modern Review*, January 1918, p 4.

'তিনি বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে অবধি চিরকাল ছেলে-পড়ানো ব্যবসাতেই এতকাল কাটিয়েছেন, অর্থাৎ বাঁধা নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও উপরওয়ালাদের হুকুম মেনে চলেচেন। সেইজন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি মৃত পদার্থের মতোই ব্যবহার করেচেন— নিজের চিত্ত থেকে তাকে কিছুই দিতে পারেন নি, বরঞ্চ তার ক্ষয় সাধন করেচেন।'[১]

১৯২৮-এর মার্চ মাসে যদুনাথ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Sir William Meyer বক্তৃতা দেন। সেটি *India Through the Ages*[২] নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাতে যদুনাথ আধুনিক যুগে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছিলেন। যদুনাথ বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আন্দোলন উনিশ শতকে রাশিয়ার আন্দোলনের অসচেতন অনুকরণ। তিনি ওই আলোচনা শেষ করেছিলেন এই বলে :

It is incorrect to call it a Hindu revival. It is really a cosmopolitan movement which aims at bringing all humanity together and hence the Eastern poet's appeal has found a response in some of the noblest hearts of the west.[৩]

যদিও এই মন্তব্যে ক্ষোভের কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে হয় না, তবে উপনিষদের সঙ্গে খৃস্টীয় তত্ত্বের মিশ্রণের কথা বলাতেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ নতুন করে জেগে ওঠে।

---

১ সমগ্র চিঠিখানির জন্য চিঠিপত্র ১২, পৃ. ১১৩-২০ দ্রষ্টব্য

২ প্রথম প্রকাশ ১৯২৮

৩ দ্রষ্টব্য "Rabindranath Tagore's 'World Mission of India'", *India Through the Ages* (1993), pp. 76-77

অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে এই পত্র প্রকাশিত হয় নি— 'আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।'[১]

এই সাময়িক বিরূপতা রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে নি। যদুনাথ সরকারের ঘনিষ্ঠ প্রিয় ছাত্র ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো লিখেছেন :

Jodunath suffers from a sort of lofty loneliness of spirit, which is his own creation. For Rabindranath Jadunath perhaps had esteem and affection bordering on sentiment.[২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিরূপে যদুনাথ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংবর্ধনায় আশীর্বাদ পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে, সেটি ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির

ফোন ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বড়বাজার ৫৫৫৫ বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ দিবস ২রা ভাদ্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই পরিষদের আরম্ভ হইতে সদস্য আছেন, এবং বহুকাল বহু কমিটি ও অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া,

---

১ বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ১২, পৃ ৪৯০-৯২

২ Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar (Panjab University, 1958) p. 54.

সভানেতৃত্ব করিয়া এই প্রতিষ্ঠানে কাজ সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রচার এবং বঙ্গভাষায় মূল্যবান সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্যে তাঁহার আজীবন শ্রম অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। পরিষৎ তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত করিয়াছে, সে আজ অনেক দিবস হইল।

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর আমরা এই মন্দিরে হীরেনবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমাদের অনেক দিনের মনের বাসনা পূরাইতে চাহি।

এই শুভক্ষণে আপনার আশীর্বাদ বাণী পাইলে আমরা পরম উৎসাহিত হইব। আশা করি আপনাকে অযথা ক্লেশ দিতেছি না।

নিঃ ইতি

বশম্বদ

শ্রীযদুনাথ সরকার

সভাপতি।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ-যদুনাথ

পত্র ১। ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে বিভক্ত করে এর কিছু অংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে। ঘোষণার সময় থেকেই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা নিয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ সালের জুন মাসে অর্থাৎ ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয় তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদবেল হইয়া উঠিবে।'[১]

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ অক্রূর দত্ত লেনে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার, শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ। এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, যদি ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাজন কার্যে পরিণত হয় তবে বঙ্গদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের বাঙালিরা ওই দিনটিকে ঐক্যদিবস হিসাবেই স্মরণ

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট, পৃ ৬১৬

করবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি প্রস্তাব করেন ওই দিন বাঙালিরা পরস্পরের হাতে হলুদ রাখী বেঁধে দেবে।

অতঃপর বঙ্গদর্শন কার্তিক ১৩১২তে প্রবন্ধটি পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

'আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বব যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙলার রাখিবন্ধনের দিন কবিযা পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সুতা বাঁধিযা দিব। রাখী-বন্ধনের মন্ত্রটি এই : ভাই ভাই এক ঠাঁই। ভেদ নাই ভেদ নাই।'

এই মন্ত্র ও ববীন্দ্রনাথ-রচিত রাখী-সংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' একটি কার্ডে মুদ্রিত করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এরূপ একটি কার্ড যদুনাথকে প্রেবণ করেন। পত্রীটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছিল : বন্দে মাতরম। / এক দেশ এক ভগবান / এক জাতি এক মনপ্রাণ। তৃতীয় পৃষ্ঠার (যা বর্তমান গ্রন্থে ১-সংখ্যক চিঠি রূপে ছাপা হল) '... যুক্ত যদুনাথ সরকার' এবং ...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অংশ ববীন্দ্র হস্তাক্ষরে। তৃতীয পৃষ্ঠার বর্ধিতাংশে ডানপ্রান্তে ৩০শে আশ্বিন ১৩১২/১৬ই অক্টোবব/১৯০৫। চতুর্থ পৃষ্ঠায "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গানটিব ১৬ পঙক্তি এবং প্রচারস্থান রূপে মুদ্রিত ছিল : ভাণ্ডাব/৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

গানটি বাখীবন্ধন উপলক্ষে বচিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব 'ঘরোয়া' (১৩৪৮), পৃ ১৭। রবীন্দ্রভবনে বক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে 'বাংলার বায়ু'র পবিবর্তে 'বাংলার হাওয়া' পাঠ, অবশ্য প্রথম মুদ্রিত রূপ 'বাংলার বায়ু'। দ্রষ্টব্য ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২, ২য় ভাগ, পৃ ২৩৭ এবং বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩১২, পৃ ৩৫২।

পত্র ২। এই সময়ে যদুনাথ পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মাঝে মাঝে আশ্রম বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য শান্তিনিকেতনে যেতেন।

১ এ বিষয়ে যদুনাথ-প্রদত্ত টীকা— 'আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করি যে কথা (প্রথম সংস্করণের) ঐ কটি ব্যালাড লিখিয়া তিনি কেন ক্ষান্ত হইয়াছেন, ওগুলি ত অতি উপাদেয় এবং যে কোনো সাহিত্যেই অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি উত্তর করিলেন বৌদ্ধ অবদান টডের রাজস্থান প্রভৃতি আধার গ্রন্থ তিনি ব্যবহার করিয়া শেষ করিয়াছেন; ফর্বস সাহেবের রচিত *Ras Mala or the Hindoo Annals of Goozerat*[১] হইতে কতকগুলি ঘটনা লইয়া

---

১ রাসমালা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী আলেকজাণ্ডার কিনলক ফরবেস-লিখিত গুজরাট প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস। অনেকটা টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড আণ্টিকুইটিস' গ্রন্থের অনুরূপ রীতিতে ইতিহাস কিংবদন্তী মিলিয়ে লিখিত। ১৮৭৮-এ প্রকাশিত 'নূতন সংস্করণ' *Rasmala* রাসমালা *or Hindoo Annals of the Province of Goozerat in Western India* (1878) গ্রন্থের ভূমিকায় মেজর জে. ডবলিউ. ওয়াটসন এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

Though professing to be a mere collection of legends or garland of chronicles, the Rasmala is in fact the first and most important epitome of the history of Goozerat hitherto made. It is a work of a profound and accurate scholar, provided by a thorough and intelligent sympathy with the people whose historical phases and domestic life he has in this work so vividly depicted.

When, too, we consider the vastness of the field of time comprehended in the single volume, streching as it does from the days of the half fabulous monarchs of Wullabhee to the middle of the nineteenth century after Christ, it must be conceeded that Mr. Forbes has most ably acquitted himself of the interesting task.

অক্স্ফোর্ড থেকে রাসমালার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৪-এ। স্পষ্টতই যদুনাথ রাসমালার দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন।

আরও কটি ব্যালাড লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ বইখানা এখন হারাইয়া গিয়াছে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে 'জয় পরাজয়' গল্পের নায়ক কবিশেখরের নামটি ঐ রাসমালা হইতে লওয়া। তখনও অক্সফোর্ড ছাপাখানা রাসমালা পুনর্মুদ্রণ করে নাই; কিন্তু আমার কাছে যে পুরাতন সংস্করণ ছিল তাহাই রবীন্দ্রনাথকে ডাকে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তিনি আরও নূতন ব্যালাড লিখিবেন, আমাদের এ আশা পূর্ণ হইল না, কেন হইল না তাহার কারণ এই পত্রে দিয়াছেন।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৫২, পৃ ৩৯৩

২ এ বিষয়ে যদুনাথ জানান, 'আমি ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ জৈন হিন্দু ও মুসলিম সৌধ ও দৃশ্যের প্রায় একশত ম্যাজিক ল্যান্টর্ন স্লাইড নিজের খরচে প্রস্তুত করাইয়া শান্তিনিকেতনে উপহার দিই এবং এই পত্রের পূর্বকার বোলপুর-প্রবাসের সময় তাহার কতকগুলি দেখাইয়া ছেলেদের সামনে বক্তৃতা করি।' কবি উপস্থিত ছিলেন।

৩ অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুগের শিক্ষক রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা। ১৯১০ খৃস্টাব্দে ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি নিয়ে বিলাতে যান। তখন ম্যানচেস্টারে দর্শন ধর্মতত্ত্ব পড়াবার জন্য একটি কলেজ ছিল। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে এই কলেজ স্থাপিত হয়, পরে ১৮৯৮তে অক্সফোর্ডে সেই কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন এই কলেজে অধ্যয়নার্থীর নির্বাচক। রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নকুমারের কাছে অজিতকুমারকে সুপারিশ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদ বিলাতে প্রচারিত হওয়ার আগেই অজিতকুমার-কৃত কিছু কিছু অনুবাদ বিলাতে প্রচারিত হয়।

পত্র ৩। ১ দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাদর্শের প্রভাবে অরুণচন্দ্র বিবাহবিমুখ হয়ে পড়ে— দীনেশচন্দ্রের এমন একটি ধারণা জন্মে। দীনেশচন্দ্র অরুণচন্দ্রকে বিবাহ দিতে চান, কিন্তু স্বাবলম্বী না হয়ে তিনি বিবাহ করতে সম্মত ছিলেন না। ফলে অরুণচন্দ্র গৃহত্যাগ করে গিরিডিতে চলে যান প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আর তার সন্ধান করতে অরুণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিরণচন্দ্র এবং ভগ্নীপতি কুলদাপ্রসাদ সেনরায় শান্তিনিকেতনে আসেন।

অরুণচন্দ্র পাটনায় যেতে পারে এই ভেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাটনায় যদুনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।[১] অরুণ-প্রসঙ্গে চিঠিপত্র দশম খণ্ডের বিভিন্ন পত্র দ্রষ্টব্য।

পত্র ৪। ১ রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন আশ্বিন ১৩০৯-এ প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থে সংকলিত হয়। যদুনাথ-কৃত এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ Sakuntala : Its Inner Meaning নামে মডার্ন রিভিউ ফেব্রুয়ারি ১৯১১তে প্রকাশিত হয়।

---

১ এ বিষয়ে বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, খণ্ড ৬, ১৯৯৩, পৃ ১৫৮ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী খণ্ড ২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ২৯৩

যদুনাথ জানান 'ঐ বৎসর ঐ বিষয়ে আমার আর একটি অনুবাদ Beauty and Self-Control নামে September 1911 সংখ্যায় (pages 225 etc) বাহির হয়।' শকুন্তলার প্রথম ইংরেজি অনুবাদ করেন এক অজানা লেখক The Sakuntala — A Review নামে ১১-১৮ ডিসেম্বর ১৯০১-এর *New India* পত্রিকায়— এ তথ্য জানিয়েছেন, প্রশান্তকুমার পাল। দ্র রবিজীবনী ৬, .পৃ ১৮৩।

২ বর্তমান পত্র লেখার দুদিন পর ৬ অক্টোবর ১৯১০-এ বিদ্যালয়ের পূজাবকাশের আরম্ভ হয়। পত্র লেখার দিন অর্থাৎ ৪ অক্টোবর বালকছাত্রেরা বিসর্জন অভিনয করে। ৫ অক্টোবর বড়ো ছেলেরা অভিনয করে প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তে রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এটি প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় অভিনয়, প্রথম অভিনয হয় ১৩১৭ বৈশাখে।

এ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪ সংখ্যক-পত্র দ্রষ্টব্য— 'আমার এই সব ছেলেদের কাছে আমি অত্যন্ত দুর্বল— এরা আমাব সংসারপক্ষেব ছেলে নয়, দ্বিতীয় পক্ষেব ছেলে— সেইজন্য এদের জোর বেশি— এরা চেপে ধরলেই আমার পথ বন্ধ।'

পত্র ৫। ১ এ-বিষয়ে যদুনাথ জানান—

'বেলজিয়ম ও লুকসেমবুর্গে ছাপান ভারত সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পিকচার পোস্টকার্ড প্রায় তিনশত বম্বেতে কিনিয়া আমি শান্তিনিকেতনে দান করি।'

২ রবীন্দ্রনাথ এবারকার শারদীয় অবকাশ শিলাইদহে কাটিয়েছেন। আশ্বিনের শেষে তিনি এখানে এসেছেন। ছিলেন কুঠিবাড়িতে।

রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে শিলাইদহকেই কর্মক্ষেত্র করে নিয়েছেন। জামাতা নগেন্দ্রনাথ এবং কন্যা মীরাদেবীও সেখানে। রথীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ শিলাইদহে কৃষিগবেষণাকেন্দ্র করবেন —এরকম পবিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ কন্যা-জামাতাদের নিয়ে সেখানেই ছুটি কাটাবেন স্থির করেছেন।

পত্র ৬। ১ এই খৃস্টমাসটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় এবারই প্রথম শান্তিনিকেতনে খৃস্টোৎসব পালিত হয়। ববীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে পাঠ করেন 'যীশুচরিত'।

এ বছব এলাহাবাদে কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে বসে। উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন সভাপতি ছিলেন। জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি অধ্যাপকের কংগ্রেসের একজিবিশন দেখার জন্য এলাহাবাদ যাওয়ার কথা হলেও তাঁদের যাওয়া হয নি। অকস্মাৎ এক জনরব উঠল যে এলাহাবাদে প্লেগ দেখা দিযেছে। একমাত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই একজিবিশন দেখতে গিয়েছিলেন।[১]

২ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয় মুর্শিদাবাদে ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাসে, এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে স্থায়ী কববার জন্য ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে খসড়া নিয়মাবলি পেশ করা হয়। পরবর্তী ময়মনসিংহ অধিবেশনে ওই নিয়মাবলি সংশোধিত ও গৃহীত হয়।

ময়মনসিংহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১–৩ বৈশাখ ১৩১৮। সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মিলনে

---

১ রবীন্দ্রজীবনী ২, চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৫, পৃ ৩০৯-১০

যান নি। বর্ষশেষ ও নববর্ষ উদ্‌যাপন তিনি শান্তিনিকেতনেই করেন।

পত্র ৭। ১ ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের মনে এখানে একটি কলেজ স্থাপনের অভিলাষ জাগে। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন :

'বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব।'

—চিঠিপত্র ১২, পত্র ৬

শান্তিনিকেতনে কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনান্তে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। আশুবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলাম বাড়িঘর তৈরি করিতে যে টাকার প্রয়োজন সে আমাদের সাধ্যাতীত— অতএব সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।'

—শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

অবশেষে ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবন অর্থাৎ কলেজ স্থাপনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন ইচ্ছা পূর্ণ হয়। শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে যে বিস্তৃত আয়োজন হয়েছিল তার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৯ ও ৩০-সংখ্যক পত্রের টীকা।

পত্র ৮। ১ এটি শারদোৎসবের দ্বিতীয় অভিনয়। অভিনীত হয় ৬ আশ্বিন। রবীন্দ্রনাথ এতে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শারদোৎসব রচিত হয় ভাদ্র ১৩১৫তে। সেই বৎসরেই পূজাবকাশের পূর্বে এর প্রথম অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ এতে অভিনয় করেন নি, কিন্তু অনুকথকের কাজ করেন।

পত্র ৯। ১ বিলাত থেকে ফেরবার সময় জাহাজে জনৈক মিশনারির ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। পাদ্রিটি উপাসনার ভাষণে ভারতীয় সমাজকে অশিষ্টভাবে আক্রমণ করে। কালীমোহন ঘোষ অবশ্য তার প্রত্যুত্তর দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৩তে বোম্বাইয়ে অবতরণ করে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাটি সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা করেন। এলাহাবাদের *The Pioneer* পত্রিকায় সম্ভবত এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৭ নভেম্বরের পায়োনিয়রে এর উত্তর দেন। এ প্রসঙ্গে ওই পত্রিকায় আবার যে মন্তব্য করা হয় যদুনাথ তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।[১]

এই পত্ররচনার দিনটি লক্ষণীয়। ২৩ নভেম্বর ১৯১৩তে কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে পাঁচশত বিশিষ্ট ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত কবিকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আসেন।

২ অচলায়তন নাটকটি রচিত হয় আষাঢ় ১৩১৮তে। প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় মুদ্রণকালে নাটক যদুনাথ সরকারকেই উৎসর্গ করা হয়, তারিখ : শিলাইদহ আষাঢ় ১৩১৮। উৎসর্গের ভাষা এই :

---

১ দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৬, পৃ ৪৩২

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।

পরবর্তী বৎসর ১৯১২তে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন কিন্তু উৎসর্গ পত্রটি ছিল না। না থাকাব কোনো বিশেষ কাবণ ছিল বলে মনে হয় না। দেখা যাচ্ছে, তার পরেও উভয়ের প্রীতির সম্পর্ক এবং পত্রালাপ অব্যাহত ছিল।

পত্রে অচলায়তন অভিনয়ের সম্ভাবনার কথা থাকলেও এবারের পৌষ উৎসবে এই নাটকের অভিনয় হয় নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে যদুনাথ আশ্রমে এসেছিলেন এবং সকালেব সভায় ম্যাজিক ল্যান্টর্ন সহযোগে অজন্তা গুহা সম্পর্কে বলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শান্তিনিকেতনে ১৩২১ এর ২৫ বৈশাখে অচলায়তনের প্রথম অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

পত্র ১০। পত্রটি তারিখহীন। মূলপত্র রবীন্দ্রভবনে নেই। পত্রের বিষয়বস্তু থেকে তারিখ অনুমান করাও সম্ভব নয়। যদুনাথেব সম্পাদনায় প্রবাসী পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩৫২) প্রকাশিত পত্রের বিন্যাস এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

পত্র ১১। ১ এ বিষয়ে যদুনাথ জানান : পাটনায় যে হেমচন্দ্র লাইব্রেরি ও বাঙ্গালা সাহিত্যসভা আছে, তাহার পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একবার পাটনা আনাইয়া স্থানীয় সাহিত্যপ্রেমীদের সহিত তাঁহাকে পবিচিত করিয়া দিতে চাই; উনি কতকটা সম্মত হন। উঁহাব একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ আনিয়া কলিকাতায় ৩০০ খানা প্রিন্ট প্রস্তুত করাইয়া আমার কাছে রাখি, ঐ সম্মেলনে বিতরণ করিবার

জন্য। সে সভা আর আমার সময়ে হইল না। কয়েক বৎসর পরে বদলি হইবার সময় ঐ সুন্দর ছবিগুলি এমনি বিতরণ করিয়া দিলাম।

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ ৩৯৫

পত্র ১২। ১ পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা। বিশ্ববিদ্যা গ্রন্থমালা প্রকাশের মূল পরিকল্পনা ছিল রামানন্দের। দ্রষ্টব্য প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ৩৮৩। রবীন্দ্রনাথ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য যদুনাথ রামানন্দ প্রভৃতিকে জোড়াসাঁকোব বাড়িতে আমন্ত্রণ কবেন। এই আমন্ত্রণের উল্লেখ রামানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৫১-সংখ্যক পত্রে আছে। এই আলোচনায স্থির হয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ছয় ভাগে বিভক্ত হবে এবং ববীন্দ্রনাথ হবেন প্রধান সম্পাদক, উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহক। সাধারণ সম্পাদক হবেন যদুনাথ। তিনি এ বিষয়ে প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৪-এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে জানানো হয় :

বর্তমান যুগে সকল সভ্যজাতির সমবেত চেষ্টায জ্ঞানের বিষয় সকল ব্যাপ্তি গভীরতা ও সূক্ষ্মতায় দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে সুগম করিবার জন্য ইউবোপীয় ভাষায অনেক সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম তথ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদেব উপযোগী গ্রন্থ ছাড়া সরল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য প্রাণালীতে রচিত অথচ আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্যাযবদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদিগের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল ভাষায় বিশ্ববিদ্যাপ্রসারিণী বক্তৃতা (University Extension Lectures) প্রদান করিয়া এই সব নবজ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণেব উপায় করিযা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এই নবোন্মেষশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যক, কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয় ভাষার সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টায় অল্পসময়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্তমান যুগের কঠোর জীবনসংগ্রামে নব্যতম জ্ঞানের পথ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ মুমূর্ষতা প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সদ্গ্রন্থের দ্বারা ভারতময় সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

এইজন্য বাঙ্গলায় এবং পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় "বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ" নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা Home University Library এবং Cambridge Mannuals of Science and Literature -এর আদর্শে রচিত হইবে।

বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পাদকগণ

ক) দর্শন (সম্পাদক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং ডাক্তাব নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ)

গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযদুনাথ সরকার)

ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা (সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)

ঙ) কলা (সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চ) শিক্ষাবিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এ ছাড়া এই প্রতিবেদনে গ্রন্থপ্রকাশের নিয়মাবলী এবং ইতিহাস বিভাগের প্রকাশযোগ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকাও দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনটি 'যদুনাথ সরকার, সম্পাদক' এই স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

'বিশ্বগ্রন্থ' সম্পর্কে যদুনাথ-প্রদত্ত টীকা :

'গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স এর স্বত্বাধিকারী হরিদাসবাবুকে রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজ তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের মতন প্রকাশ করিতে সম্মত করি এবং আমার আলোচনার ফল কবিকে জানাই। প্রথম প্রস্তাবিত সিরিজের একটা আভাস প্রবাসী পত্রিকার (১৩২৪, ১৭ ভাগ প্রথম খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠায়) 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' নামক প্রবন্ধে দিয়াছি।'

—প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২

২ ১৯১৬তে রবীন্দ্রনাথ যখন মার্কিনদেশে যান, তখন তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যে উদ্দেশ্যে আমি যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা দিতে এসেছি তার মূলে আছে আমাব একমাত্র কামনা— ভারতবর্ষে আমার বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। এইটিই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা।'[১] এরই ফলস্বরূপ লিনকন শহরবাসীরা

---

১ *Loss Angeles Calif Times*. ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৬তে প্রকাশিত বিবরণ, ড. জয়তী ঘোষের অনুবাদ। দ্রষ্টব্য বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৬, পৃ ২২৫।

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি ছোটো মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেয়। ১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন প্রেসের পত্তন। ১৩২৬-এর প্রথম থেকেই এই ছাপাখানা থেকে আশ্রমের যাবতীয় ছাপার কাজ ও রবীন্দ্রনাথের গানের বইগুলি ছাপা হতে থাকে।[১]

৩ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস/ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী। ১৯০৮ সালে চিন্তামণি ঘোষ কবির গ্রন্থ প্রকাশেব ভাব গ্রহণ করেছিলেন।

৪ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারীর পুত্র। ১৮৮৪তে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি (৯৭ নং কলেজ স্ট্রীট) ছিল তাঁর প্রকাশালয়। সে-সময রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজেব বইগুলি ২৩০৯ টাকায় বিক্রি করে দেন।

৫ মাইকেল স্যাডলাবের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কাবের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিশন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের নিকট শিক্ষাবিষযক প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথেব এই চিঠি লেখার কয়েকদিনের মধ্যেই স্যাডলাব কমিশন শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান। কমিশনেব বিপোর্টে শান্তিনিকেতনেব শিক্ষাদর্শেব উল্লেখ আছে।[২] রবীন্দ্রনাথ যে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানেব বিশেষ পক্ষপাতী, এতে তার উল্লেখ ছিল। প্রায এই সময়েই যদুনাথ মডার্ন বিভিউ পত্রিকায় (১৯১৮ জানুযাবি) The Vernacular Medium :

---

১ দ্রষ্টব্য শান্তিনিতেকন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। সংবাদ ১১ নং । ইহাতে আশ্রমের যাবতীয ছাপাব কাজ ও গুরুদেবের সঙ্গীত পুস্তকাদি ছাপা হইতেছে।

২ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ পৃ. ১০৪-১০।

Views of an Old Teacher নামে প্রবন্ধ লেখেন। তাতে মাতৃভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উল্লিখিত আছে।

পত্র ১৩। তারিখটি প্রবাসী-তে মুদ্রিত পাঠ থেকে সংগৃহীত।

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যু ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (৬ জুন ১৯১৯)।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের পদত্যাগপত্রের অনুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে (২ জুন) রামেন্দ্রসুন্দর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়ে বলে পাঠান 'আমি উত্থানশক্তি বহিত । আপনাব পায়েব ধূলা চাই।' ববীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে মূল পত্রখানি পড়তে অনুবোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ পত্র পড়েন এবং বামেন্দ্রসুন্দর তাঁব পদধূলি গ্রহণ করেন। তারপর রামেন্দ্রসুন্দর যে তন্দ্রায় মগ্ন হলেন সেটিই তাঁর মহানিদ্রা।

রবীন্দ্রনাথ ১৭ জুন শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। ৩ আগস্ট রবিবার রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আবার চলে আসেন।

পত্র ১৪। তারিখটি সম্ভবত যদুনাথই মূল পত্রের শীর্ষে লিখে রেখেছিলেন। ১৯২১-এর জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

বিদেশভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ও ভাষণে যে শিক্ষাদর্শ প্রতিফলিত হয়, তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনমূলক। এ-বিষয়ে দ্রষ্টব্য সি. এফ. অ্যান্ডরুজকে লেখা *Letters from Abroad* এবং *Letters to a Friend*। জয়তী ঘোষ -প্রণীত 'বিদেশভ্রমণে

রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থেও বিদেশে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুবাদ ও উদ্ধৃতি আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৯৭) 'বিদেশ হইতে পত্রধারা' অধ্যায়ে (পৃ ৮৬-৯৮) এ সময়ের রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিন্তাতে রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ে মগ্ন ছিলেন বলেই অনুমান করা যায় যে তিনি এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন।

২ সিলভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন ১০ নভেম্বর ১৯২১। এই সূত্রে যদুনাথকে লেখা সি. এফ. অ্যান্ডরুজের চিঠিটিও উদধৃত করা যায় :

6 D N Tagore Lane
Calcutta [1921]

My dear Jadu Babu

The Poet has asked me to write to you and ask you if it would be possible for you to come to Calcutta towards the end of this week where there are holidays, I believe. He has very much that he wishes to talk over with you and he is very anxious indeed to see you. He is in such a rush of visitors that he has wished me to write for him. He is staying over Sunday in Calcutta.

Yours very sincerely
C. F. Andrews

এ সময় যদুনাথ কটকে অধ্যাপনা করছিলেন।

পত্র ১৫। ১ রবীন্দ্রনাথের এই পত্র যদুনাথের যে-পত্রের উত্তরে লিখিত হয়, সেটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল। রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে বিশ্বভারতী পরিচালকসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে

চিঠি দেন। যদুনাথ সে-পদ গ্রহণ করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন কয়েকটি নীতিগত কারণে। এই পত্র দুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৪-সংখ্যক পত্রে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ফিরে এসে যদুনাথের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেছেন। সেই চিঠি লেখা হয়েছিল ২৭ আগস্ট। ওই চিঠিতে উল্লিখিত ছিল যে সিলভ্যাঁ লেভি নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে আসবেন। যদুনাথ এই চিঠির কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে ২৩ ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ পৌষ ১৩২৮) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠার সভায় যদুনাথ উপস্থিত ছিলেন মনে হয় না।

পরিষদের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর গভর্নিং বডির সদস্য মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তদনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ যদুনাথকে গভর্নিং বডির সদস্যপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করে ১৯২২-এর মে মাসের শেষে চিঠি দেন।[১] রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উত্তরেই যদুনাথ একটি দীর্ঘপত্র লেখেন (১১মে ১৯২২)। যদুনাথের প্রত্যাখ্যানের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত মনে বর্তমান আলোচিত পত্রটি লেখেন। সেই পত্র যদুনাথ পান দার্জিলিঙে ৬ জুন ১৯২২-এ।

যতদিন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম মাত্র ছিল, ততদিন যদুনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাগত আদর্শে মতৈক্য ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উচ্চতর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করবার সূচনাতেই যদুনাথ বিরূপ হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কিছুকাল যাবৎ তিনি

১ এই চিঠির প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে নেই।

যদুনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। ১৩২৫-এর ৮ পৌষ (১৯১৮, ২৩ ডিসেম্বর) আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতী স্থাপিত হয় এবং 'চিত্র সংগীত প্রভৃতি কলা এবং সংস্কৃত পালি ইংরাজী প্রভৃতি সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়।' সম্ভবত এই সময় থেকেই যদুনাথ— আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকেন।

শান্তিনিকেতনকে বিশ্বমানবসংস্কৃতির মিলনতীর্থরূপে পরিণত করার অভিলাষ রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই পোষণ করে আসছিলেন। এই ইচ্ছার স্পষ্ট প্রকাশ ১১ অক্টোবর ১৯১৬তে রথীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে :

...তারপরে এও আমার মনে আছে যে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগেব সূত্র করে তুলতে হবে— ঐখানে সার্ব্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে— স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে— ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলনযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ যায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোল বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে— সর্ব্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।

—চিঠিপত্র ২। লস এঞ্জেলস। ১১ অক্টোবর ১৯১৬।

এই চিঠির অনেক আগে ৩ মার্চ ১৯১৩ সিকাগো থেকে ববীন্দ্রনাথ লেখেন :

মানুষের শক্তির যতদূর বাড় হবার তা হয়েছে, এখন সময় এসেছে যখন যোগের জন্য সাধনা করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা কি সেই যুগসাধনার প্রবর্তন করতে পারব না? মনুষ্যত্বকে

বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করে তার আদর্শ কি আমরা পৃথিবীর সামনে ধরবো না? এ দেশে তার অভাব এরা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। ...মানুষকে তার সফলতাব সুরটি ধরিয়ে দেবাব সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখীদের কণ্ঠে সেই সুরটি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না?

১৯১২তে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ও আমেরিকায় গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকার বিদ্যালযেব যোগ স্থাপিত হয়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর পরিচিতি আরও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৬তে আমেরিকায় গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থলে ভাষণ দেন। তখনই তাঁর মনে স্বভাবতই সর্বজাতিব মিলনমূলক শিক্ষাদর্শের ভাবনা দেখা দেয। এ বিষয়ে যদুনাথকে লিখিত ১৪-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতপক্ষে ১৯২১-এ বিশ্বভাবতী সাংগঠনিক রূপ পাওয়ার আগেই লোকচক্ষুর অন্তরালে ১৯১৮-ব ডিসেম্ববে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল। তখন এই সূচনাটি বাহিরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে নি। তখন এখানে প্রাচ্যসংস্কৃতির চর্চাই ছিল প্রধান। ১৯১৯-এর জুলাই (১৩২৬, ১৮ আষাঢ়) থেকে এর কার্যধারা শুরু হয়। ঐ দিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

তারপরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত।... সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের

বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ; উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি।

—শান্তিনিকেতন, শ্রাবণ ১৩২৬

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন করে তাদের এই উচ্চতর লক্ষ্যে —চিন্তায়-কর্মে, ধ্যানধারণায় জীবনচর্যায় পরিপূর্ণতার পথে পৌঁছে দেওয়া। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতি দিনই ঘটে।

বিশ্বভারতীর উদার শিক্ষানীতি ‘মস্তভাব’ ব্যক্ত হয়েছে ‘শান্তিনিকেতন’-এর আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৬, সংখ্যায় :

আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

...বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে, সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে

হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

দেখা যাচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণায়ত বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ-শান্তিনিকেতনে সমগ্র বিশ্বকে ভাবাদর্শের দিক থেকে একটি নীড়ের আশ্রয়ে মিলিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এজন্য বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠনের ব্যাপারেও পঠিতব্য বিষয়গুলি ছিল বিচিত্র। সাহিত্য চিত্র ও সংগীত। সাহিত্যের মধ্যে ছিল সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান, বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, সিংহলি। প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাকাল ছয় বৎসর। প্রথম তিন বৎসরে বিষয়টির সাধারণ জ্ঞান এবং পরের তিন বৎসর বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

—দ্র শান্তিনিকেতন ১৩২৭ মাঘ, পৃ ৫৭৩-৫৮০।

এই পাঠপদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের কোনো স্থান ছিল না। শিক্ষার্থীরা স্বাধীন ভাবে অভীপ্সিত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারত। বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ স্পষ্টভাবেই জানান :

The Visva Bharati is for higher studies. The system of examination will have no place whatever in the Visva Bharati, nor is there any conferring of degrees.
Students will be encouraged to follow a difinite course of study but there will be no compulsion to adopt its rigidly.

—দ্র শান্তিনিকেতন ১৩২৭, পৃ ৫৭৩

এই নবপরিকল্পিত পাঠক্রমে অধ্যয়ন করার জন্য অনুমোদিত কোনো

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল না। পঠনীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত অধিকার ও অনুরাগই ছিল যোগ্যতার নির্ণায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তখনও শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয় নি।[১] ছাত্রছাত্রীরা আশ্রম-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেই বিশ্বভারতীতে প্রবেশাধিকার পেত।

এই শিক্ষাপদ্ধতি যদুনাথ অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি যে উপযুক্ত যোগ্যতা সৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের মধ্যে অধ্যয়ন, বিদ্যার উৎপাদন অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রে কঠোর শ্রম-সাধনার দ্বারা নির্দিষ্ট ফল লাভকেই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন, তাঁর পত্রেই তাব প্রমাণ আছে। তাঁর মনে হয়েছিল বিশ্বভারতীতে নীতিনিয়মেব কঠোরতা নাই। কেবল আদর্শ ও ভাবের পরিবেশই এখানে রচিত হয়েছে। পূর্বতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিশু ও কিশোরদের পক্ষে এটা উপযোগী হতে পারে, কিন্তু বিশ্বভারতীর উচ্চতব বিদ্যাচর্চাব ক্ষেত্রে এটি উপযোগী নয়। বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই উচ্চতর পাঠক্রমে প্রবেশাধিকারকে যদুনাথ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পাবেন নি।

পত্র ১৬। ১ বহু ভাষাবিদ রুশদেশীয় পণ্ডিত বগদানফ (L. Bogdanov) ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতীতে পারসিয়ান অধ্যাপকেব পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩০ সালেব জুন মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য কারণে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন।

---

১ শিক্ষাভবন (কলেজ বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ জুলাইতে, এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

যদুনাথকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁব সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হন। যদুনাথ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। সেইজন্যই পারসিয়ান অধ্যাপক পদে তাঁর নাম সুপারিশ কবে বাংলা ও ইংরেজি পত্রদুটি রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

I know Mr Boagdanov and, I am sure, it will be difficult to find any one more fit for the post which he applies for.

Rabindranth Tagore
Nov. 30, 1927

পত্র ১৭। দার্জিলিঙে যদুনাথ টোঙ্গা রোডের বাড়িতে এ সময়ে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় সেখানে ছিলেন। যদুনাথের গৃহে প্রস্তুত ছানা তিনি ববীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। ১০ জানুয়ারি ১৯৩১-এ যদুনাথ এই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান :

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

আমাব বাড়িতে প্রস্তুত টাটকা ছানা একটু আপনার জন্য পাঠাইলাম। যদি খাইয়া পছন্দ করেন প্রত্যহ পাঠান যাইবে।

বিনীত
শ্রীযদুনাথ সবকাব

ছানা নিয়মিত পাঠানোব ঘটনা যদুনাথের ছাত্র কালিকারঞ্জন কানুনগো বর্ণনা করেছেন : We once saw him carrying for the poet in Darjeeling some sweets prepared by Lady Sarkar.[১]

---

১ *Jadunath Sarkar Commemoration Volume* (Punjab University, 1958), p 54.

তারিখটি প্রবাসী-তে প্রকাশিত পাঠ থেকে সংগৃহীত।

পত্র ১৮। যদুনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই পত্র লেখেন :

9 Tonga Road
Darjeeling
8th June 1933

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আশা করি আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। শ্যামকান্ত সরদেশাই-এর স্মৃতি কথা কিছু লিখিতে সম্মত হইয়াছেন। যদি আপনি বলিয়া যান তবে একজন কেহ তাহা লিখিয়া লইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আজ প্রাতে রথীর সহিত করিয়া আসিয়াছি। এখন বোধহয় কাজটা শেষ করিয়া ফেলিতে সময় পাইবেন? আবশ্যক হইলে আমি এখান হইতেও লেখক পাঠাইতে পারি।

নিঃ ইতি

শ্রীযদুনাথ সরকার

১ শ্যামকান্ত সরদেশাই যদুনাথের ঐতিহাসিক বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সখারাম সরদেশাইয়ের সঙ্গে যদুনাথের মারাঠা ইতিহাস গবেষণার সূত্রে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ১৯০৪ থেকে। এ-সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও যদুনাথের পরিচয়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যদুনাথ অন্তত ১৯১০ থেকেই মাঝে মাঝে গিয়েছেন বলে চিঠিপত্রের উল্লেখে জানা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে যদুনাথের উদ্যোগেই সরদেশাই পুত্র শ্যামকান্তকে (১৮৯৯–১৯২৫) শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করতে পাঠান। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্যামকান্ত আশ্রম-বিদ্যালয়ের

ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯১৬-তে এখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি পরে বম্বে থেকে বি.এ. বি.এস্‌সি. এবং বার্লিন থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বার্লিনে থাকতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৮ নভেম্বর ১৯২৫-এ সুইজারল্যান্ডের ডাবোস প্লাজের পার্ক স্যানিটোরিয়মে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৩৩ সালে শ্যামকান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে পিতা মাতামহ প্রভৃতিকে লেখা শ্যামকান্তের চিঠিপত্রের একটি সংকলনগ্রন্থ ('শ্যামকান্ত চীঁ পত্রেঁ') প্রকাশিত হয়। ওই গ্রন্থের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পত্রটির প্রতিলিপি এবং তার মারাঠি অনুবাদ ছাপা হয়েছে।

গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। শুরুতে খণ্ড পহিলা—শান্তিনিকেতন ডিসেম্বর ১৯১২ - এপ্রিল ১৯১৬। শ্যামকান্তের এই পর্বের চিঠিতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা দিক এবং তৎকালীন আশ্রম-পরিবেশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

২ শ্যামকান্তের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় ওই কিশোর বয়সেই তিনি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় হিসাবে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলায় তিনি বিশেষভাবে যত্ন নিযে পড়তেন। বিদ্যালয়ের হস্তলিখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বাগান' এবং 'প্রভাত' পত্রিকা দুটির তিনি সদস্য এবং নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই-সব পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু লেখার নিদর্শন : 'মহারাষ্ট্র দেশের আচার ও ব্যবহার', 'মনকে উপদেশ (রামদাস স্বামী)', 'কোষ', 'সদ্বিবেক' (বাগান), মহারাষ্ট্রের ইতিহাস

(শান্তি) 'একটি আশ্চর্য পশু', 'তানাজী মালুসরে কর্তৃক সিংহগড় বিজয়', 'মহারাষ্ট্রীয় উপনযনের অনুষ্ঠান' (প্রভাত)।

এই অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা ও গল্পের তিনি মারাঠি অনুবাদ করে মারাঠি পত্রিকা 'আনন্দ-এ' প্রকাশ করেন। দ্র. শ্যামকান্ত চাঁ পত্রে— ৩/২/১৪ এবং ২১/৬/১৪ তারিখের পত্র।

পত্র ১৯। ১ যদুনাথের প্রদত্ত টীকা থেকে জানা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব একটি পিএইচ. ডি. থীসিসের পরীক্ষক ছিলেন যদুনাথ ও ববীন্দ্রনাথ। যদুনাথ এ সম্বন্ধে আব কোনো তথ্য জানান নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সিন্ডিকেটে ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ গৃহীত সিদ্ধান্তে দেখা যায় উপেন্দ্রনাথ বল Rammohan Roy শীর্ষক গবেষণা নিবন্ধ পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। সেই নিবন্ধের পরীক্ষক নিযুক্ত হন ড. ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর এন. এল., স্যার পি. এস. শিবস্বামী আয়াব কে. সি. এস. জি., সি. আই. ই. এবং স্যার এস. রাধাকৃষ্ণন কেটি., এম. এ., ডি-লিট.। কিন্তু পরে শিবস্বামী আয়ার পরীক্ষক হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে ১৬ ফেব্রুয়াবি ১৯৩৪-এর সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্যার যদুনাথ সরকার পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

গবেষণা সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ একমত হলেও রাধাকৃষ্ণন অনকূল ছিলেন না।

২ ১৯৩৪-এর ৬ মে ইচাংগো জাহাজে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে সিংহল যাত্রা করেন। শিল্পী ও অভিনয়ের দল আগেই রেলপথে চলে গিয়েছে। এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর জন্য

অর্থ সংগ্রহ করা। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উক্তির তাৎপর্য এই পরিপ্রেক্ষিকাতেই পঠিতব্য। ২৮ জুন তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

৩ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) ছিলেন ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ। তাঁদের বন্ধুত্বের মধ্যেও কখনও সংশয়মাত্র দেখা দেয় নি। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ১৮৯২ সালে রিপন কলেজে তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেই কলেজেই অধ্যক্ষপদে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় কীভাবে হয়েছিল বলা যায় না। তবে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমাবধি সাহিত্যপিপাসু ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি 'নবজীবনে' বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন; ক্রমে ক্রমে 'সাধনা' ও 'ভারতী'তেও তিনি লিখতে থাকেন। তাঁর এই-সব প্রবন্ধের সূত্রেই বিজ্ঞানবিষয়ের লেখকরূপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলমর্ম্ম' প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে ১৮৯৬তে তাঁর বই 'প্রকৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবেই ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা।

'বঙ্গভাষার লেখক'-এ লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের আত্মকথায় জানা যায় ছাত্রাবস্থায় তিনি ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ করতে অভ্যস্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মক্ষেত্রে। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর (১৩০১) থেকেই রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি ছিলেন। তা ছাড়া কাশিমবাজারের মহারাজার নিকট থেকে পরিষদের জন্য যে-জমি কেনা হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্যতম ন্যাসরক্ষক। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের

প্রবন্ধ 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রকাশিত হয়। তার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যপরিষদের সঙ্গে সহকারী সভাপতি ও অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরও প্রথমাবধি পরিষদের সভ্য, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদক রূপে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এর সেবা করে গিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রসাহিত্যের গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন, তাঁর চিন্তা ও প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন।[১] রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনীকাব প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর সমাজ ও ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক মত পোষণ করিতেন ; তৎসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অন্তরের গভীর একটি যোগ ছিল। উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। কবির মুখে ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনো বিরূপ সমালোচনা করিতে শুনি নাই।"[২]

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে ভাবচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই সমানভাবে উদবেলিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাখিবন্ধন' উৎসবের প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষেই রচনা করেন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি। বামেন্দ্রসুন্দর ওই বিশেষ দিনে (৩০ আশ্বিন ১৩১২) অরন্ধনের প্রথার প্রস্তাব করেন।

---

১ কোনো কোনো সময় দুজনের মধ্যে যে মতভেদ হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (১৩১৪ শ্রাবণ) 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধে রাজনৈতিক পথ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন বামেন্দ্রসুন্দর তাকে সমর্থন করতে পারেন নি।

২ রবীন্দ্রজীবনী ২য়, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৮৩ পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৫ পৃ ৪৭২-৭৩

এই উপলক্ষেই ঘরে ঘরে পড়ার জন্য তিনি লেখেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। তিনি এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায়। ২৭ ফাল্গুন ১৩১১তে জেনারেল অ্যাসেমব্লি হল-এ রবীন্দ্রনাথ পড়েন 'সফলতার সদুপায়'।[১] এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রামেন্দ্রসুন্দর। কোনো কোনো প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথেব মত শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করেছেন।

১৩১২তে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি, রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করতে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথই প্রস্তাব করলেন, 'বাঙলাদেশ এবং বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্যের জন্য সমস্ত বাঙলাদেশ ব্যাপিয়া, সমস্ত বাঙালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙলাব ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্যটার সূচনা হইতে পারে।'[২] রবীন্দ্রনাথেব এই প্রস্তাবের ফলে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীব আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ এবং ১৮ কার্তিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনেব প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতি। উদবোধন-অনুষ্ঠানে রামেন্দ্রসুন্দর একটি দীর্ঘ

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪

২ অভিভাষণ, মানসী ১৩২১, পৃ ৪২৩

প্রবন্ধ পড়েন— প্রবন্ধটির নাম ‘মাতৃমন্দির’।[১]

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর সৌহার্দ্যের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁদের জন্মদিন পালন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে টাউন হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন বাঙালির এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক ঘটনা। রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৯ এবং ৩০-সংখ্যক পত্রের টীকায় সংবর্ধনা সভার বিবরণ দেওয়া আছে। সাহিত্য পরিষদের পক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরই রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনাপত্রটি রচনা করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপর আয়োজনের দায়িত্বভার অর্পিত হলে পরিষৎ-সম্পাদক হিসাবে তিনি সানন্দে সে দায়িত্বপালনে অগ্রসর হন। রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনাজ্ঞাপনের বিরোধিতা করে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে চিঠি লিখলে রামেন্দ্রসুন্দর তার অতিযুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পক্ষে। এর কিছুদিন পরেই নোবেল পুরস্কারের সংবাদ আসে।

আবার ১৩২১ সালে রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে পরিষৎ এক সান্ধ্য সম্মেলনে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বরচিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দনপত্র বচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রামেন্দ্রসুন্দরের ৭-সংখ্যক পত্রের টীকায় তা সম্পূর্ণ উদধৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রের সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধার অবিস্মরণীয় মর্মস্পর্শী

---

১ ‘নানাকথা’য় সংকলিত

নিদর্শন রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিমকালের ঘটনা। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি :

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরণের কয়েক দিন পূর্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নবভারতে ত্যাগের দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাহার পদত্যাগ পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ কবেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রেব এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। বামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল।[১]

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জয়ন্তীতে সাহিত্য পবিষদ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। তার উত্তরে প্রসঙ্গত ববীন্দ্রনাথ বলেন :

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি

---

১ সাহিত্যসাধকচরিতমালার 'বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা থেকে সংকলিত, পৃ ৮৯।

দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই স্নিগ্ধ হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর

পত্র ১। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ড্রামাটিক ক্লাব উঠে গেলে ২৪ মাঘ ১৩০৩ (শুক্রবার ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) খামখেয়ালী সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম সভার আহ্বায়ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। পরে আশুতোষ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তিদের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানে সভা আহূত হয়। গল্পপাঠ, আহার, গান-বাজনার আয়োজন থাকত সভায়। বর্তমান পত্রে রামেন্দ্রসুন্দরকে রবীন্দ্রনাথ এ রকম একটি সভায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এই সভার আমন্ত্রণকর্তা সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। সভা বসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন নিমন্ত্রণপত্রও বেশ মজার ছিল। একটা স্লেট ছিল, সেটা পরে দারোয়নরা নিয়ে রামনাম লিখত, সেই স্লেটটিতে রবিকাকা প্রত্যেকবারে কবিতা লিখে দিতেন, সেইটি সভার সভ্য ও অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ওই ছিল খামখেয়ালীর নেমন্তন্ন পত্র।' কবিতার আকারে নিমন্ত্রণপত্রটি রচনা করতেন রবীন্দ্রনাথ ৪ শ্রাবণ ১৩০৪ (১৯ জুলাই ১৮৯৭)-এর নিমন্ত্রণপত্রটি ছিল এরকম—

এতদ্দ্বারায় notification
খামখেয়ালীর সভাধিবেশন
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
জোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বার
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে যোড় হাত।
যিনি রাজি আর যিনি গররাজি
অনুগ্রহ করে লিখে দিন আজই।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামখেয়ালী সভার কার্যবিবরণীর সঙ্গে এই নিমন্ত্রণপত্রটি পাওয়া যায়।[১] রামেন্দ্রসুন্দরকেও এটি পাঠানো হয়েছিল কিনা বোঝা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর খামখেয়ালী সভার সদস্য ছিলেন না। সম্ভবত এবারই প্রথম তিনি আহূত হলেন। ৪ শ্রাবণের কার্যবিবরণী পাওয়া যায় না বলে রামেন্দ্রসুন্দরের সভায় উপস্থিতির কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই।

অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ছিলেন না। সাধনা পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি লেখা বেরিয়েছে। তা ছাড়া এই সভার মাস কয়েক পূর্বে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম' (১৮১৯ শক, বৈশাখ, ইংরেজি ১৮৯৭) বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পত্র ২। ১ নভেম্বর ১৯০৫ সালে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে 'স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসের গুটিকয়েক সূত্র' নাম দিয়ে স্বাদেশিকতাবোধের উদ্‌বোধনে বাঙালি সমাজের নানা প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয় চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী

---

১ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খামখেয়ালী সভার প্রতিবেদন এবং কবিতায় রচিত আমন্ত্রণলিপির খাতা ও অন্যান্য আকর থেকে এইসভার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্রষ্টব্য 'খামখেয়ালী সভার প্রতিবেদক রবীন্দ্রনাথ', দেশ শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৮।

শিল্পের, স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী games-এর প্রদর্শনী হইত— স্বদেশী গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তাহার পর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশী ভাবের বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশী ভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে ষ্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজ-কোম্পানির সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন... তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে যাত্রী সংগ্রহ ও যাত্রী ভাঙানর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fuller-এব আমলে ঘটিলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কনগ্রেস গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের দিকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র এইরূপ আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি চালনার দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Stores-এর অভ্যুদয়।...

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ২ চলিতেছে, তখন যোগেশ চৌধুরী কংগ্রেসে শিল্প-প্রদর্শনী খুলিয়া কংগ্রেসের আবেদন-প্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন— তাহার পর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে ২ চলিতেছে।'

—চিঠিপত্র ১০, পৃ. ৩১-৩৩

স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ব্যবস্থা নানা উপলক্ষেই আয়োজিত হচ্ছিল। স্বদেশী ভাণ্ডার নামক এক যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে এ রকম একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই পত্রে স্বদেশী ভাণ্ডারের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তার একটি ইতিহাস আছে। ১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে অম্বিকাচরণ উকিল নামে এক উদ্যোগী শিক্ষিত যুবক স্বদেশী ভাণ্ডার লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের বিশেষ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি তহবিল থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে এই ভাণ্ডারে দিয়েছিলেন।[১]

২ ১৩০৪-এর কার্ত্তিক মাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করবেন বললেও আসলে ১৩০৫-এর বৈশাখ থেকে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এক বছর সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যার পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী ৪, পৃ. ১৫৪।

৩ মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত নেতা বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) ১৮৯৭ সালে জুলাই মাসে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির দ্বারা প্ররোচিত হয়েই দুটি মারাঠা যুবক ১৮৯৭-এর জুন মাসে দুইজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। বিচারে তিলকের দেড় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। তাঁর সমর্থনের জন্য বোম্বাইয়ে উকিল পাওয়া যাচ্ছিল না। তিলক কলকাতায় অমৃতবাজাব পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষকে অবস্থা জানালে কলকাতার কৌঁসুলী নিয়োগের ব্যয় নির্বাহার্থ চাঁদা তোলার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে সাগ্রহে যোগ দেন এবং তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে একহাজার টাকা সংগ্রহ করেন। মোট সতেরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। কলকাতা থেকে দুজন ইংরেজ ব্যারিস্টার প্রেরিত হন। কিন্তু কারাদণ্ড রোধ করা গেল না দেখে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার জন্য 'তিলক ডিফেন্স ফন্ড' গঠিত হয়। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। চিঠির তারিখ থেকে বোঝা যায় এই দ্বিতীয়বারের উদ্যমের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতে বলার কারণ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বোম্বাইয়ের মোকদ্দমায় ইংরেজ কৌঁসুলীর জুনিয়র রূপে কাজ করেছিলেন।

পত্র ৩। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের 'ভূগোল' বইটির প্রকাশকাল চৈত্র ১৩০৪, ইংরেজি ১৮৯৮। এই বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্বাসপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তার কারণ বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' রামেন্দ্রসুন্দরের নিম্নলিখিত মন্তব্য :

আমার প্রধান ভয়, অনেক কথা বর্জন করিয়াও যাহা রাখিয়াছি, তরুণ মস্তিষ্কের পক্ষে তাহাও নিতান্ত অল্প হইবে না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ আয়ত্ত করা অনেকটা কঠিন হইবে। কিন্তু সকল কথাই আয়ত্ত করিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। পাঠের সময় বালকেরা যদি একটা অনতিস্ফুট ছবি মানসচক্ষুতে দেখিতে পায়, তাহাতেও ফল আছে। গ্রন্থের ভাষা অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয় যদি ছাত্রগণকে উপদেশ দেন, ও তাঁহার যত্নে বালকের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত করিতে এবং শিখিবার বাঞ্ছা উদ্রেক করিতে যদি এই গ্রন্থ কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে তাহা হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।

২ রবীন্দ্রনাথ ভাবতীর সম্পাদনাভার গ্রহণ করার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধ ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি প্রবন্ধ ভারতীতে বের হয়েছিল : 'শিক্ষাপ্রণালী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫, 'নানা কথা' বইতে সংকলিত), 'আচারে যুক্তি' (শ্রাবণ ১৩০৫, 'আচার' নামে 'কর্মকথা'য় সংকলিত) এবং 'বৈজ্ঞানিক পিশাচ' (ফাল্গুন ১৩০৫, 'উত্তাপের অপচয়' নামে 'জিজ্ঞাসা'য় সংকলিত)।

পত্র ৪। ১ স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫) তাঁর অনুজা সরলা দেবীর (১৮৭২-১৯৪৫) সহযোগে ১৩০২-১৩০৪ বঙ্গাব্দে ভারতী সম্পাদনা করেছেন। হিরণ্ময়ী প্রতিভাময়ী ছিলেন এবং সমাজসেবামূলক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। মহিলা আন্দোলন-সম্পর্কিত অনেকগুলি রচনা হিরণ্ময়ী-সম্পাদিত ভারতীতে বেরিয়েছে। ভারতীর ১৩২৩ বৈশাখে 'কৈফিয়ৎ' নামে হিরণ্ময়ী দেবীর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য।

পত্র ৫। ১ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্‌কালে ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে (১৭ চৈত্র, ১৩১১, বৃহস্পতিবার) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের অভ্যর্থনার জন্য ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধটি পড়েন। এই সভা আহ্বানের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ছিল। পরিষদের একাদশ কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়, দেশের পারিপার্শ্বিক জীবন থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে স্বদেশের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ধারে ছাত্রদের প্রবর্তিত করার একটি প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। পরিষদ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সভার আয়োজন করে এবং রবীন্দ্রনাথকেই এ বিষয়ে ভাষণ দিতে অনুরোধ করে। এই সভার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মেদিনীপুরের মৃগাঙ্কনাথ রায় নামে জনৈক ছাত্র তাঁকে নিজের আগ্রহ জানিয়ে চিঠি লেখেন। মৃগাঙ্ক সদ্য এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'আমাদের মাতৃভাষার, প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। পবিষদের সদুদ্দেশে সাহায্য করিতে ও আমার এ ক্ষুদ্র শক্তি বঙ্গ ভাষার উন্নতিসাধনে প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।' মৃগাঙ্কনাথের এই চিঠির অপর পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে বর্তমান পত্রখানি লেখেন।

২ ৯ বৈশাখ ১৩১২ (২২ এপ্রিল ১৯০৫) তারিখে ময়মনসিংহ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর সঙ্গে একটি সারস্বত সম্মিলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। ২৯ মার্চে *The Bengalee* পত্রিকায় বিশেষ

সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ মুদ্রিত হয়েছিল : 'Babu Rabindranath Tagore will preside at the inaugural meeting of the Mymensingh Saraswat Exhibition.' কিন্তু অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নি।

৩ স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় (বৈশাখ ১৩১২)। এর উদ্যোক্তা ছিলেন চট্টগ্রামের যুবক কেদারনাথ দাসগুপ্ত। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেদারনাথ লিখেছিলেন : "আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভাণ্ডারে' ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। দেশে মাঝে মাঝে যে সকল কথা উঠিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে নানা বিচক্ষণ লোকের সংক্ষিপ্ত মত সংগ্রহ করিয়া 'ভাণ্ডারে' একত্র রক্ষা করা হইবে।' এইজন্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাণ্ডার পত্রিকাতে চারটি বিভাগ ছিল— প্রবন্ধ, প্রস্তাব, প্রশ্নোত্তর এবং সঞ্চয়। সঞ্চয় অংশে থাকত বিদেশের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র থেকে নানা ঔৎসুক্যজনক প্রবন্ধের সার সংকলন।

পত্র ৬। ১ স্কুলে বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র দুজন— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এঁরা দুজন আশ্রমে সদ্য আগত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিচালনায় বুদ্ধচরিতের অনুবাদ করছিলেন। পরে রথীন্দ্রনাথের হাতে অনুবাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয় এবং 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' নামে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী থেকে সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়।

২ ইতিপূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন প্রবন্ধে মত প্রকাশ করে আসছিলেন যে 'ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ'। ১৮৯৭

খৃস্টাব্দে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন 'Discovery of living Buddhism in Bengal'। এ মত পরবর্তীকালে স্বীকৃত না হলেও রাঢ়ের ধর্মপূজা সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৪, প্রথম সংখ্যা), 'গ্রামদেবতা' নামে প্রবন্ধ লেখেন।

৩ বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার স্বামী বিবেকানন্দ ও বালগঙ্গাধর তিলকের প্রবল দেশাত্মবোধক কার্যকলাপ, রুদ্রপন্থায় বিশ্বাসী তরুণদের আত্মদান এবং বঙ্গভঙ্গ নামক ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালি শিক্ষিতজনের মধ্যে 'নেশন' বা জাতি ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্ন বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচিত হয়। এই প্রবন্ধকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই-সব প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনাত্মক প্রকৃতি বিচার করে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরেব এই ধরনের প্রবন্ধ 'পরাধীনতা' প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায় (১৩০৪ অগ্রহায়ণ)। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লেখেন হিন্দুর একনিষ্ঠতা (১৩০৮ বৈশাখ)। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কয়েকটি প্রবন্ধ :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮)
হিন্দুত্ব (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)
নেশন কী (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮)
ভারতবর্ষের ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৯)

এসময়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয় উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় প্রবন্ধগুলি

'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত আছে। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩১৯)।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ 'রাষ্ট্র ও নেশন' বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র ১৩০৮) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তাঁর 'নানাকথা' বইতে সংকলিত আছে। তাঁর অপর প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষেব ইতিহাস' ভাণ্ডারে (শ্রাবণ ১৩১২) প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি সম্ভবত আলোচিত পত্রে ববীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার উত্তরে লিখিত।

৪ রবীন্দ্রনাথেব ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর সম্পাদনায় ১৩১২-র বৈশাখ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় 'খেয়ালখাতা' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিল। এর প্রথম লেখক ছিলেন বীরবল, লেখার নাম 'খেয়ালখাতা'। তার পরেই সম্পাদিকা 'খেয়ালের চৌহদ্দি' নাম দিয়ে টিপ্পনী লেখেন : 'সম্পাদিকার নিমন্ত্রণে ভারতীর খেয়ালখাতার দেউড়িতে গুণীজনাগ্রগণ্য বীরবল মহাশয় সান্ত্রীর খেয়ালে চাপিয়া আসিয়া যজ্ঞের আয়োজনকারিণীকে সন্ত্রস্ত করিতেছেন। তিনি কাকে রাখেন, কাকে মারেন। অতএব পরিমাপে "খেয়াল" এর চৌহদ্দির একটা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়াছে।' খেয়ালখাতার প্রথমবারের লেখক ছিলেন বীববল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'সৌন্দর্য্য' নামে একটি সরস মন্তব্য এবং রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে একটি তীব্র সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'আমাদের বাড়িতে একটি খাতা প্রচলিত ছিল' সেটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। এটি রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে বর্তমানে সংরক্ষিত। এতে ৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২ (২৫ নভেম্বর

১৮৯৫) পর্যন্ত নানা জনের নানা বিষয়ক মন্তব্য লেখা আছে। তার পরে ১৩১৯-এ লেখা মন্তব্য।

৫ বেঙ্গল একাডেমি অব লিটাবেচার (১৮৯৩, ২৩ জুলাই প্রতিষ্ঠিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত (১৮৯৪, ২৪ এপ্রিল, ১৭ বৈশাখ ১৩০১ বঙ্গাব্দে) হওয়ার অব্যবহিত পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। সে-সময় রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সহকারী সভাপতি। তখন থেকেই বামেন্দ্রসুন্দর মৃত্যুদিন পর্যন্ত পরিষদের নানা পদে নিযুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও ১৩০১-১৩০৩, ১৩০৮, ১৩১২-১৩১৬ পর্যন্ত সহকারী সভাপতি ছিলেন। সে-সময় পরিষদের কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৩১১ থেকে ১৩১৮ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পরিষদের সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ পরিষদের অন্তর্গত 'ছাত্রসভা' নামক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার নেওয়াব অনুরোধ জানিয়েছেন।

পত্র ৭। জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে এই চিঠিতে ব্যক্ত ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি তাঁর বিরূপতা বিশেষ তাৎপর্যবহ।

স্বদেশী আন্দোলনেব যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতিব বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে এই শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বদেশেব প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয় না। প্রচলিত শিক্ষানীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্বেই প্রকাশ পেয়েছিল 'শিক্ষাব হেরফের' প্রবন্ধে (সাধনা, ডিসেম্বর ১৮৯২)।

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে (১৯০১) তিনি নিজস্ব শিক্ষাদর্শে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শ থেকে ভিন্নতর এক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রচলিত স্কুলের থেকে ভিন্ন আদর্শের জাতীয় বিদ্যালয় অন্যত্রও তৈরি হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশন -পরিচালিত বিদ্যালয় এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে নতুন বেগ সঞ্চার হয়। ১৯০৪-এর ইউনিভার্সিটি বিল প্রণয়ন করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণকে নিরঙ্কুশ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে (আষাঢ় ১৩১১) নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেন :

'সর্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহাতে সাজ সরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে —কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আসীন হইবেন।'

—য়ুনিভার্সিটি বিল, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৩।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ' পড়েন চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে (৭ শ্রাবণ ১৩১১, ২২ জুলাই ১৯০৪)।[১] শিক্ষাসমাজ প্রভৃতির বিভিন্ন কাজে শাসকমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যোগই গড়ে তুলবার পবামর্শ রবীন্দ্রনাথ বার বাব দিচ্ছিলেন।

---

১ সাধারণের বিশেষ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি কার্জন রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয়বার পড়েন ১৬ শ্রাবণ ১৩১১, ৩১ জুলাই, ১৯০৪-এ।

১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর (আশ্বিন ৩০, ১৩১২) বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করা হল। নানা দিকে আন্দোলন চলেছে। অতঃপর ২৩ কার্তিক ১৩১২ (২৪ অক্টোবর ১৯০৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ফীল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত সভায়। ৮ নভেম্বর রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[১]

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠনপ্রণালীর খসড়া তৈরি করবার জন্য যে সভা বসে, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এদের ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতিতে তাঁর সম্পূর্ণ সায় ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা এই পত্রে তাঁর সেই মনোভাব ফুটে উঠেছে। 'শিক্ষার আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকা ভাণ্ডার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩১২) প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

'বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল সভাসমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন।[২]

---

১ সুমিত সরকার, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908,* p. 162.

২ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৫২৭। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বক্তৃতা রচনাবলীর এই খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হয়েছে।

ভাণ্ডারের এই সংখ্যা প্রকাশের পরদিনই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে এই পত্র লেখেন, স্মরণ করা যেতে পারে। এই চিঠি লেখার পরেও অবশ্য রবীন্দ্রনাথ জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র রচনা প্রভৃতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা করে কলিকাতা টাউন হলে ২৯ আশ্বিন ১৩১৩ তারিখে প্রবন্ধ পড়েন 'জাতীয় বিদ্যালয়'।

পত্র ৮। ১ কাশীতে ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ শেষ করে পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য (১৮৭৮-১৯৫৯) শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি যোগ দিয়েছিলেন ২৪ জানুয়ারি ১৯০৫-এ। এখানে এসে তিনি মাধ্যন্দিন শতপথব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এর প্রথম খণ্ড ১৩১৬ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভারতশাস্ত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। পরবর্তী কয়েকটি পত্রেও এই অনুবাদ প্রসঙ্গে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর কীভাবে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তা লক্ষণীয়।

২ জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অনুরোধক্রমে ১৯০৭-এর জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের মধ্যে 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি'— এই চারটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধগুলি বঙ্গদর্শনে যথাক্রমে পৌষ ১৩১৩, মাঘ ১৩১৩, বৈশাখ ১৩১৪ এবং আষাঢ় ১৩১৪তে প্রকাশিত হয়। এই পত্রে সর্বশেষ প্রবন্ধ 'সাহিত্যসৃষ্টি'র প্রসঙ্গই উল্লিখিত। এই প্রবন্ধটির নাম প্রথমে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন 'মহাকাব্য'। প্রবন্ধটি

তিনি দীনেশচন্দ্র সেনকে পড়ে শুনিয়েছিলেন তাতে ইলিয়াড ওডিসি রামায়ণ মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে বলেই।[১]

জাতীয় শিক্ষাপরিষদে রবীন্দ্রনাথ যে এই ভাষণগুলি দেবেন, সে বিষয় *The Bengalee* ২৪ জুন ১৯০৬ সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হয় : At the invitation of the National Council of Education, Bengal, two of their members Babu Rabindranath Tagore (Director of Studies in Bengali for the Bengal National College) and Babu Mohini Mohan Chatterjee, M. A. B. L., have kindly undertaken to deliver courses of extension lectures at the above college at No. 191–1, Bowbazar Street. Babu Rabindranath Tagore's lecture will be on "Comparative Literature" and will be delivered in Bengali. The first lecture of the series will be delivered on Sunday, the 27th January at 4 P.M. sharp. Babu Mohini Mohan Chatterjee's lecture will be on "The Study of History" and will be delivered in every alternate Saturday at 4 P.M. commencing from the 2nd February.[২]

৩ বহরমপুরের প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলন ১৩১৩ সালে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য। মুলতুবী সভার অধিবেশন সাহিত্য পরিষদের রংপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজন করা যায় কিনা সেই চেষ্টা চলেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেই সভাতে সভাপতি রূপে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। মুলতুবী সভাতেও তিনিই ছিলেন সভাপতি। রংপুরের সেই সভা হয় নি। বহরমপুরেই পরে ১৩১৪-র ১৭-১৮ কার্তিক সেই সভা

---

১ দ্রষ্টব্য প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৫ম, পৃ. ৩৫৮।

২ তদেব, ৩৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথই সভাপতিত্ব করেছিলেন।

এই সাহিত্যসম্মেলন সম্পর্কে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখেছেন : 'রামেন্দ্রসুন্দরের চেষ্টায়, আমার ক্ষীণ যত্নে ও রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৩১৪ সালে কাশিমবাজারে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন হয়। তৎপরে অদ্যাবধি বৎসরের পর বৎসর সাহিত্য সম্মেলন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম সম্মেলনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইতেছে।'[১]

রামেন্দ্রসুন্দর এই সম্মিলনে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন তার শিরোনাম 'মাতৃমন্দির'। প্রবন্ধটি 'নানাকথা' বইতে সংকলিত আছে।

পত্র ১০। ১ সদ্যবিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রনাথ বরিশালে যান জ্যৈষ্ঠের শেষে অথবা আষাঢ়ের প্রথম দিকেই (১৩১৪)। বরিশালে মীরার শ্বশুরালয়। সেখান থেকেই চট্টল হিতসাধনী সভার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ চট্টগ্রামে যান। বরিশাল এবং চট্টগ্রাম দুজায়গাতেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের তিনি সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপনে উৎসাহিত করেন। এর মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথেরই সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে দেশের মধ্যে সংহতি নিয়ে আসবার স্বপ্ন ও বাসনা। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সময় থেকেই তিনি বাঙালির মধ্যে ঐক্যকে অব্যাহত ও অনৈক্য দূর করবার জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন করতে বলে আসছিলেন। ১৩১৩ চৈত্র মাসে বহরমপুরে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের জন্য লিখিত 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

---

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর', ১৩২৭, পৃ. ২০।

'বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্য পরিষদের শাখাস্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কী উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি।'

পত্র ১১। ১ বস্তুত কলিকাতা যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেও পাঁচ দিন পরেই ২২ আষাঢ় ১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন। ২৪ আষাঢ় : ৯ জুলাই ১৯০৭ তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁর চতুর্থ প্রবন্ধ 'সাহিত্যসৃষ্টি' পড়েন। অপর তিনটি প্রবন্ধ পূর্বেই পড়া হয়ে গিয়েছিল।

পত্র ১২। ১ শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে সংগ্রহ করবার আশায় বিধুশেখর রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন (১০ আষাঢ় ১৩১৪)। সেই চিঠিরই শেষের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের এই পত্র লিখিত।

বিধুশেখরের এই চিঠিতে মুর্শিদাবাদের কান্দি স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদের জন্য পণ্ডিত রমেশচন্দ্র বেদান্তবিশারদকে সুপারিশ করতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

পত্র ১৩। ১ মীরাদেবীর অসুস্থতা। পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

২ সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দরের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কথাই বলা হচ্ছে। তখনও এই অনুবাদটি মুদ্রিত হয় নি। এটি ভারতশাস্ত্র-পিটকের প্রথম গ্রন্থরূপে ১৯১১তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

পত্র ১৫। ১ পাবনায় ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ইতিপূর্বে সুরাটে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে চরমপন্থীরা বিতাড়িত হন। পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনে দুদলের বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। চরমপন্থীরা অশ্বিনীকুমার দত্তকে সভাপতি করতে চেয়েছিল। নরমপন্থীরা নিরপেক্ষ রবীন্দ্রনাথকে মনোনীত করে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন উভয় পক্ষকে সম্মিলিত করে গঠনমূলক কর্মে প্রণোদিত করতে।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের 'ধ্বনিবিচার' প্রবন্ধটি সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (১৩১৪ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা) প্রকাশিত ও পরে 'শব্দকথা'য় (১৯১৭) সংকলিত হয়। 'শব্দকথা'র ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন এই বলে :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত এবং সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনা পড়িয়া কয়েকটা কথা আমার মনে আসে।... রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের নিকট আমি ঋণী— আর কাহারই বা কাছে এমন ইঙ্গিত পাইতে পারি? এই ইঙ্গিত না পাইলে বোধ করি, ধ্বনি-বিচার প্রবন্ধের উৎপত্তি হইত না।'

পত্র ১৬। ১ ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় ভাড়াটে বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ২১ অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের গৃহপ্রবেশ–উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন।[১]

---

১ দ্রষ্টব্য পরিষৎ পরিচয় ১৩৪৬, পৃ ২৮।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে সম্মতি জানান।

২ খুলনা সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন 'হুঙ্কার' নামে একটি কবিতার বই লিখে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। রাজদ্রোহমূলক কবিতা বলে বইটি সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং বাজেয়াপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত ছিল বলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত খুলনার আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়। এই মামলায় হীরালাল সেনের দেড় বছরের জেল হয়েছিল।[১]

জাতীয় বিদ্যালয় উঠে গেলে রবীন্দ্রনাথ হীরালাল সেনকে ১৯১০-এর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ দেন। 'কিন্তু বঙ্গীয় সরকারের কোপদৃষ্টি থাকায় শেষ পর্যন্ত কবি তাঁহাকে আশ্রমে রাখিতে পারিলেন না। ১৯১১-র শেষভাগে তাঁহাকে নিজ জমিদারিতে কবি কাজ দেন। সেখানে কার্যে নিযুক্ত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।[২]

পত্র ১৭। ১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নূতন গৃহপ্রবেশ-উৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণ। ১৬-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষণের লিখিত রূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়-এ (পৃ ৫৩৬-৩৯) সংকলিত হয়েছে।

২ গৃহপ্রবেশ-উৎসব সভার দিনই (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রষ্টব্য

---

১ দ্রষ্টব্য চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, ১৩৯২, পৃ. ২৬-২৮।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ২ (১৩৫৫), পৃ. ১৮৩।

পরিষৎ পরিচয়, পৃ. ৪৪। রবীন্দ্রনাথ এর কয়েকদিন পরেই পিতৃদেবের ছবি তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলছেন কেন বোঝা যায় না।

পত্র ১৮। ১ শব্দতত্ত্ব বইটির প্রকাশ ১৯০৯-এ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে। ১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের গদ্য রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শব্দতত্ত্ব মজুমদার লাইব্রেরি-প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ১৫-সংখ্যক গ্রন্থ। এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ছিলেন সুহাসচন্দ্র মজুমদার। ২ লালগোলার রাজা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য ঠিক কী ধরনের বদান্যতা করেছিলেন, জানা যায় না। যোগীন্দ্রনারায়ণ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দরের বৈবাহিক।

পত্র ১৯। ১ আসানসোলের চরণপুর অঞ্চল থেকে এই চিঠি লিখেছিলেন (২৬ আষাঢ় ১৩১৬) রাসবিহারী মণ্ডল। তাঁর চিঠির অপর পৃষ্ঠাতেই ১৯-সংখ্যক পত্রখানি লিখিত।

পত্রলেখক শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধীন মাইনিং ইন্সপেক্টর অব বেঙ্গল-এর একজন সহকারী। পাথুরে কয়লা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েও তিনি পরিভাষার অভাবে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত আছেন জেনে তিনি পত্রযোগে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৮ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় রাসবিহারী মণ্ডলের 'খনিবিদ্যার পরিভাষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এবং ওই সম্বন্ধে আলোচনা করেন অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

২ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩১৩ সালের কার্তিক সংখ্যার প্রবাসীতে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামে প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'সোনার তরী' কবিতার অস্পষ্টতা দোষের কথাই নানাভাবে বলেন। পরের সংখ্যার প্রবাসীতেই যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে লেখেন 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা। ১৩১৩ সালের আশ্বিনের 'সাহিত্য' পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন 'একটি পুরাতন মাঝির গান (সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা)— এটি 'সোনার তরী' কবিতার প্যারডি।

এই-সব সমালোচনা ও বিতর্কের কথা মনে করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার তরী কবিতার সম্পর্কে পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য করেন্।

৩ কাল্কা থেকে ফিরে কবি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। তার পর তিনি চলে যান শিলাইদহে নির্জনবাসে। পূর্ববর্তী পত্রে (সংখ্যা ১৮) রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বই পাঠাবার নির্দেশ প্রকাশককে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন।

পত্র ২০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধ 'মায়াপুরী' পড়েন ২ আশ্বিন ১৩১৬। এই পত্রটি তার পূর্বে লিখিত। রামেন্দ্রসুন্দরের এই প্রবন্ধটি তাঁর 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে সংকলিত আছে।

পত্র ২১। ১ লালগোলার রাজাবাহাদুরের প্রসঙ্গ ১৮-সংখ্যক পত্রে দ্রষ্টব্য।

২ এই পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপাত্র হয়ে রবীন্দ্রনাথেব বরোদায় যাওয়ার কথা আছে। বরোদায় মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মিলন হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৬-৮ কার্তিক। সেই সম্মিলনে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যান নি। রবীন্দ্রজীবনীতে

উল্লিখিত আছে 'শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া কার্তিক মাসটা তথায় থাকিয়া অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় পুনরায় পিতাপুত্রে ভ্রমণে বাহির হইলেন।'[১] গৌরহরি সেনকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে রমেশচন্দ্র দত্ত মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে বরোদায় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষে তাঁকে দু-তিনখানা পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন 'যাইতে পারি নাই বলিয়া অদ্য আমার হৃদয় অনুতপ্ত আছে।'[২]

পত্র ২২। ১ এই পত্রে তারিখ নেই। তবে পূর্বপত্রের অনুবৃত্তি বলে অনুমিত। আগের চিঠিতে পত্ররচনাস্থলরূপে শিলাইদহের উল্লেখ ছিল। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় এ-সময়ে পিতৃসহবাসে শিলাইদহে দিনযাপনের মনোরম বিবরণ আছে। প্রভাতকুমারের বিবরণে দেখা যায়, শিলাইদহে থাকতেই ২৭ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ একটি রাখীসংগীত রচনা করে শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দেন।

পত্র ২৪। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের ২৯ ভাদ্রের পত্রে তাঁর ডায়বেটিস রোগের আক্রমণের সরস উল্লেখের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য।

২ ১৭ আশ্বিন থেকে ছুটির কথা লিখলেও পূজাবকাশ আরম্ভ হয ১৯ আশ্বিন (৫ অক্টোবর ১৯১০) থেকে। ১৭ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখেন :

'আমাদের ছুটি আসন্ন হয়েছে। পশুদিন থেকে ছুটি আরম্ভ হবে। আজ ছেলেরা মিলে বিসর্জ্জন অভিনয় করবে— কাল বড়র দল প্রায়শ্চিত্ত করবে।... এবারে সকলে আমাকে বৈরাগী সাজবার জন্যে

---

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২, ১৩৫৫, পৃ. ২১২।

২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ৭ সংখ্যা ১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ৪৮।

নিতান্তই চেপে ধরেছে— রাজি হয়েছি— তুলনায় পাছে হটে যাই এ ভয় যে একেবারে মনে নেই তা বলতে পারিনে'। প্রায়শ্চিত্ত প্রথমবার অভিনীত হয় গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে— 'অজিতকুমার তখন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।'

৩ রামেন্দ্রসুন্দর 'বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা', নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবালয়' নামক প্রতিষ্ঠানে ৭ আশ্বিন ১৩১৭ (২৪ সেপ্টেম্বর)। ওই প্রবন্ধটি পরে 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামে জিজ্ঞাসা গ্রন্থে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ছিলেন, সুতরাং প্রবন্ধপাঠের আসরে তাঁর উপস্থিত থাকা খুবই সম্ভব।

পত্র ২৫। ১ কান্তকবি নামে পরিচিত রজনীকান্ত সেনেব মৃত্যুর উল্লেখ থেকে মনে হয় এই পত্র ১৩১৭ সালের ২৮-এ ভাদ্রের কয়েক দিনের মধ্যে লিখিত হয়। সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর প্রয়াত কবির পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য সাহিত্য পরিষদের পক্ষে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করার সম্ভাবনা চিন্তা করেছিলেন এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে জড়িত করার প্রস্তাব করেন। সেই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য। রজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ইতিপূর্বেই ছিল। 'বাণী' 'কল্যাণী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা গীতিকার রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ২৮ ভাদ্র ১৩১৭তে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যানসার রোগে মারা যান। মৃত্যুর তিন মাস আগে ২৮ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। কী কঠিন সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি রোগযন্ত্রণা বহন করছেন, তা দেখে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে যান। তখন রজনীকান্ত বাকশক্তিরহিত। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে

ফিরে গেলে রজনীকান্ত এই গানটি লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দেন —'আমার সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে দূর।'[১] রবীন্দ্রনাথ ১৬ আষাঢ় রজনীকান্তকে লেখেন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

এ-রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দূর্গ, যত কারাগার
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়।...

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই-সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই, পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে

১ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ২৯ জুন (১৫ আষাঢ়) তারিখে লেখা রজনীকান্তের পত্রে ১ আষাঢ়ে লেখা 'এই মুক্তপ্রাণের দৃপ্তবাসনা তৃপ্ত করিবে কে?' গানটি উদ্‌ধৃত হয়েছে।

ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশি করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্তস্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে? মানুষের আত্মার সত্যপ্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থিমাংস ও ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত-বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য!

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেইদিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে তবে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যে-গানটি পাঠাইয়াছেন, তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট বাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন— আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে— অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন আজ আপনার জীবনসংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষাসংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১]

---

১ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, 'কান্তকবি রজনীকান্ত' (১৯৬৮), পৃ. ১৬১-৬২।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্ধারযোগ্য :

রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি সামান্যই ছিল। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁহার গান তাঁহার মুখে শুনিয়াছি এবং রোগশয্যায় যখন ক্ষতকণ্ঠে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন একদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই স্বল্প পরিচয়ে তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে সে আমি তৎকালে তাঁহাকে পত্রদ্বারাই জানাইয়াছিলাম। সেই পত্র এই বর্তমান গ্রন্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।...

ভূমিকার তারিখ শান্তিনিকেতন ৩১ আশ্বিন ১৩২৮।

পত্র ২৬। ১ হরিপ্রসাদ মিত্র আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথ-নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির অবস্থাকালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। দ্রষ্টব্য নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে লেখা পত্র : "আজ তোমাদের একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল— তাঁর নাম হরিপ্রসাদ মিত্র— তিনি কর্নেল য়ুনিভার্সিটির ছাত্র। তাঁর সঙ্গে অনেক কথার আলোচনা হল। তোমাদের কথাও হল।" দ্র. দেশ শারদীয় ১৩৯৮, পৃ ৩০।

পত্র ২৭। ১ এই পত্র সাহিত্যপরিষদ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরকে আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত। কিন্তু সেই বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে এই পত্র আলোচিত হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। ১৩১৮, ৩১ বৈশাখ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সারদাচরণ মিত্র সভাপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সহকারী সভাপতি হন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত হয় নি বলেই পত্রটি নথিভুক্ত হয় নি এবং রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে। জগদীশচন্দ্র বসু ১৩২৩ সালে পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন।

২ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯৫ সাল থেকেই ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে আসছিলেন। ভারতীতে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১৩০৫)। অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশের সম্ভাবনাকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 'বাঙ্গলা ইতিহাসে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তক' বলে সংবর্ধনা করেন।

পত্র ২৯, ৩০। এই দুই পত্রে জন্মোৎসব পালনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ১৩১৮-র ২৫ বৈশাখ। এই উপলক্ষে 'ভক্তিপ্রণত আশ্রমবাসিবৃন্দ' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমাধিপতি পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উৎসবে অর্ঘ্যাভিহরণ প্রদান করে। অর্ঘ্যাভিহরণে মঙ্গলগীতি, আবাহন, অর্ঘ্যাভিহরণ এবং শান্তি— এই চারটি নামে মন্ত্র সংকলিত ও উচ্চারিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৪ বৈশাখ, ১৩১৮-এ বিগত ১৩১৭-র পৌষ মাসে প্রকাশিত রাজা নাটকের অভিনয় হয়। এটি রাজা নাটকের দ্বিতীয়বারের অভিনয়ানুষ্ঠান। প্রথমবার

অভিনয় হয় ৫ চৈত্র, ১৩১৭। রবীন্দ্রনাথ পূর্বের মতো এতে ঠাকুরদার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ পড়েন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনের প্রায় নয় মাস পরে ১৪ মাঘ ১৩১৮ (২৮ জানুয়ারি ১৯১২)[১] কলকাতায় টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবিকে বিরাট আকারে সংবর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও আয়োজন নয় মাস পূর্বে বৈশাখ মাস থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। স্মরণীয় এই যে কোনো সাহিত্যিককে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের ঘটনা এই প্রথম। এ-কথা তৎকালীন সংবাদপত্রের বিবরণে এবং অন্যত্র বিশেষ ভাবেই উল্লিখিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় (২৯ জানুয়ারি ১৯১২) এইদিনটিকে বলা হয়েছিল A Red Letter Day in Bengali Literature. এই পত্রিকায় সেদিনের কবিসংবর্ধনার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

নয়মাসব্যাপী আয়োজনের পরিকল্পনা এবং সূচনা কেমন করে হয়েছে, তার বিবরণ আছে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম কয়েকজন তরুণ ভক্তদের মধ্যেই উদিত হয়। 'আমাদের অনামিকা গৃহসভায় একদিন কথা উঠিল— কবি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবেন, এই উপলক্ষে তাঁহার শুভ শতায়ু কামনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন কল্পে একটি প্রকাশ্য সংবর্ধনা করিতে হইবে।'[২] একটি সভা ডাকা হল। তাতে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী,

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রত্যেকে একশো টাকা দিলেন। অতঃপর তাঁরা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিপ্রায় জানালেন। চিত্তরঞ্জন প্রথমে একটি চেক পরে আর-একটি চেক দিলেন। আরো চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্র বাগচী নাটোরের মহারাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তিনিও 'সম্মানোচিত' সাহায্য করলেন। বহরমপুরে কলেজিয়েট স্কুলে একটি সভা আহ্বান করে তাঁরা তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে কাশিমবাজারের মহারাজা, লালগোলার মহারাজা, বৈকুণ্ঠনাথ সেন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে তাঁরা স্থির করেন রবীন্দ্রনাথের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রহণ করলেই ভালো হয়। সেজন্য পরিষদ-সম্পাদক বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তাঁবা দেখা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর সাগ্রহে এতে সম্মতি দিলেন। তদনুযায়ী পরিষদ গৃহে তিনি একটি সভা আহ্বান কবেন তাতে উপস্থিত ছিলেন সারদাচরণ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ। উৎসব পালনের জন্য একটি অভ্যর্থনাসমিতি গঠিত হল, তাতে সদস্য হলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সারদাচরণ মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র কিশোর বাযচৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁদের স্বাক্ষরে জনসাধারণের উদ্দেশে কবিসংবর্ধনা নামে নিবেদন পত্র প্রচারিত হয়। এই পত্রটির খসড়া করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত :

'আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন।

রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ; তিনি বহু বর্ষ নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

'ইতিপূর্বে আমরা দেশের সাহিত্যিকগণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই ; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

'রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।

'সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় কবিরা উদ্দেশ্যে কোনও লোকহিতকব স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

'সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে

সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

সমিতির সদস্যগণ

উপরে উল্লিখিত নয়জনের স্বাক্ষর[১]

প্রবাসীর ১৩১৮ বৈশাখ সংখ্যায় অর্থাৎ মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসবের নয় মাস পূর্বেই এই বিজ্ঞপ্তিটি ঈষৎ পরিবর্তিত পাঠান্তরে প্রকাশিত হয়। তাতে সদস্য হিসাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা ছাড়া সর্বশেষে একটি বাক্য ছিল 'সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩ নং সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে।' শান্তাদেবী লিখেছেন, 'জন্মোৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামানন্দও (অন্তরালে) ছিলেন ; তবে যাঁহাদের নামে চিঠি বাহির হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না।' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত সাহিত্যে (শ্রাবণ ১৩১৮) এ-বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল :

'রবীন্দ্রনাথেব 'সম্বর্ধনার' দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই বিবাহসভার 'হ্যাণ্ডবিলে'র মত স্তবরচনার সূচনা হইয়াছে। এক "প্রবাসীর অঙ্গেই স্তবপঞ্চক প্রকটিত দেখিতেছি"।'

রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার বিরোধিতা কারা করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। বেঙ্গলী পত্রিকায় টাউন হলে অনুষ্ঠিত জন্মোৎসব সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বায় বা সুরেশচন্দ্র

---

১ *The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement,* Saturday Sept. 13. 1941 — (Reprint 1986)-এর ১১৫ পৃষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে-লেখা বিজ্ঞপ্তিটির ফোটোচিত্র দেওয়া আছে।

সমাজপতির নাম নেই, যদিও তৎকালীন তরুণ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকদের নাম পাওয়া যায়। ২৯ জানুয়ারি ১৯১২ বেঙ্গলী পত্রিকায়, ১৩১৮-র ফাল্গুন সংখ্যার ভারতীতে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। ভারতীতে লেখা হয়েছিল :

'যাঁহারা পুরীতে সমুদ্র দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সাগরতরঙ্গ যখন বেলাভিমুখে ধাবিত হয় তখন কেমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত স্থলাংশটুকু আচ্ছন্ন করে, প্লাবিত করে, তিরোহিত করে। এক একটা উত্তালতরঙ্গ উত্থিত হয় আর তখন এ পিঠের ও পিঠের কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিনকার সভার কার্য্যারম্ভকালে জনতরঙ্গ সেইরূপ উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিল।'

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র সভার উদবোধন করেন। তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। সেদিনের সভাতেও তিনিই সভাপতিত্ব করেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী -রচিত সংগীত 'বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভামাঝে গাওয়া হল দরবারী সুরে।' মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন।[১]

তারপরে ভাষণ দেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। এই বিবরণ প্রাসঙ্গিকবোধে কিয়দংশে উদ্‌ধৃত হল :

'নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ অর্ঘ্যদান করিতে উঠিলেন। অনেকদিন ইহাকে কোন সভাসমিতিতে দেখা যায় নাই।... তাই আজ তাঁহাকে অনপেক্ষিতভাবে বেদীর উপর অর্ঘ্যহস্তে দেখিয়া

---

১ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী উপনিষদ থেকে মন্ত্র পাঠ করেছিলেন পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ আচার্য।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণসখা অর্জুনের ন্যায় নির্ভীক সত্যসন্ধী মহারাজ আজিকার কবিসূয় যজ্ঞে শিশুপালধর্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল বড় নিপুণতার সহিত প্রথমে তাহাদের খবর লইলেন। সভামধ্যে একটু বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া গেল। তিক্ত স্বাদের সম্ভাবনার আভাসটুকু দিয়া মধুস্বাদকে আরও তিনি ঘনীভূত করিয়া দিলেন। বক্তব্যের পরিশেষে মহারাজ কবিসখাকে অর্ঘ্যদান করিলেন।'

এর পরেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় উপলক্ষে (১৮৮১) তিরিশ বৎসর পূর্বে যে কবিতা লিখেছিলেন 'উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর' সেটি পড়ে শোনালেন। তার পরেই পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নিম্নলিখিত সংবর্ধনাপত্রটি পাঠ করলেন।

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নবশতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদ্‌গণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ্বব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন;

মনীষিগণ স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসমুসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী-কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে আনয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃতকণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর

উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৬ মাঘ সম্পাদক

কবি তার যথোপযুক্ত উত্তর-ভাষণ দান করেন।

১৩১৮ ফাল্গুনের প্রবাসীতেও 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিভাগে 'রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা' নামে বেশ বড় একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাতে শেষে বলা হয় :

তাঁহার সংবর্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না। যাহা হইয়াছে তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।'

টাউন হলের এই সভা ছাড়াও পরদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ছাত্রসভ্যগণ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করে। আর-একদিন সংবর্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্যসম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে। দ্বিতীয় দিনের সভাতেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পড়েন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব।'

টাউন হলে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরেও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে এই অনুষ্ঠান করার জন্য সমালোচনা হয়। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে একটি চিঠি লেখেন। তার উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর অনুষ্ঠানের সমর্থনে লেখেন :

১২ পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০ মাঘ ১৩১৮

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহুবৎসরের সাহিত্য সেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা কবিয়া তাঁহার স্থান নির্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্যসেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেণ্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত

হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্তা ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহাকে সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ গ্রন্থ সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্বতন সাহিত্যরথীদিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করেন। বিদ্যাসাগব, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেননা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না— হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মর মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ৺নবীনচন্দ্রের মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চুন কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন ও উহা পরিষৎ মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্তি স্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।[১]

---

১ প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারীরা তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ মহাজনদের কাছে বন্ধক রেখেছিল। গ্রন্থসংগ্রহ নীলামের জন্য বিজ্ঞাপিত হলে লালগোলার রাজার দৃষ্টি তাতে আকৃষ্ট হয়। তিনি সেই বই কিনে পরিষৎকে দান করেন। পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরই নেপথ্যে উদ্যোগী হয়ে ওই সংগ্রহ পরিষদে আনাবার ব্যবস্থা করেন। দ্রষ্টব্য আশুতোষ বাজপেয়ী, রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা, পৃ. ১৪৯।

অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য পরিষৎ একটা অপূর্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্য গণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্ধনা কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। এই চাঁদা সর্বসাধরণের নিকট তোলা হয় নাই; তাঁহাদের নিজেরাই ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবতঃ অন্যূন সাত হাজার টাকা এই রূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সংবর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। মফস্বলবাসীরা দূরে থাকেন, সকল তথ্য জানিতে পারেন না; তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা কেন যে এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন বুঝি না।...

আপনার কুশলপ্রার্থী
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রবীন্দ্রনাথের এই সংবর্ধনার কিছুদিন পর তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তখন পত্রান্তরে (৫ অগ্রহায়ণ, ১৩২০) রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন : 'রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটিকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না ; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজেদের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে।...

ভবদীয়

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[১]

পত্র ৩১। ১ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৯ সালে (১৯০২ খৃ.) সংস্কৃতের শিক্ষক রূপে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রথমে 'সংস্কৃত প্রবেশ' তিন

---

১ আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর' বইয়ের পৃ. ১৫৩-৫৬তে উদ্‌ধৃত। পত্র দুটি পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৩২৭ সালের শ্রাবণ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

খণ্ড রচনা করেন। ১৩১২ সাল (১৯০৫) থেকে তিনি অভিধান প্রণয়নে রত হন। ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে তিনি আর্থিক অসংগতির জন্য কলকাতায় কাজ নেন। সে-সময় রবীন্দ্রনাথই কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীকে বলে হরিচরণের পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। তার পর শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে ১৩৩০ সালের ১১ মাঘ এই অভিধান সমাপ্ত করেন। শেষ চারবছর তাঁর বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে ষাট টাকা হয়েছিল।

কিন্তু এই সুবৃহৎ অভিধান মুদ্রণের ব্যবস্থা করা যায় নি। অতএব গ্রন্থকার নিজ ব্যয়েই অভিধান ছাপতে আরম্ভ করেন। ১৩৩৯-এ এই অভিধানের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়।

হরিচরণ কলকাতায় আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে অভিধান বিষয়ে পত্র লিখেছেন।

পত্র ৩২। এই চিঠিখানি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা নয়। দেশ পত্রিকায় যে-সংখ্যানুক্রমে এটি মুদ্রিত হয়েছিল রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সেই অনুক্রমেই রক্ষিত আছে বলে পত্রটি যথাযথ মুদ্রিত হল।

পত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হওয়ায় বর্তমান সম্পাদক দেশের পত্র-সম্পাদক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উমাপ্রসাদ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানান এই পত্রটি কবি লেখেন গৌরহরি সেনকে। গৌরহরি সেন ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক। এই লাইব্রেরির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর দুজনেরই ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভুলবশত বঙ্গবাণী ও দেশ পত্রিকায় চিঠিখানি সংযোজিত হয়।

পত্র ৩৩। ১ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রামেন্দ্রসুন্দরের ৩০ কার্তিক ১৩২০ পত্রের উত্তরে লিখিত। 'কোলাহল ত বারণ হল'— এটি গীতিমাল্যের গান। গীতিমাল্য প্রকাশিত হয় ১৯১৪তে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। সুতরাং গানটি পূর্বেই রচিত হয়েছিল যদিও গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে গৃহীত হয় নি। এই গানের রচনাকাল ১৮ চৈত্র, ১৩১৮। কিন্তু ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে এই গানের অনুবাদ আছে No more noisy loud words from me, such is my master's will (No. 47)। রদেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন, এটি তার দ্বিতীয় কবিতা। সেই পাণ্ডুলিপিতে বাংলা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ কবির স্বহস্তে লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে এবং মুদ্রিত পাঠে দুটি মাত্র শব্দের পার্থক্য আছে।

পত্র ৩৪। ১ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে কন্যা মীরা এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বুদ্ধগয়া ভ্রমণে যান। সেখান থেকে এলাহাবাদ আগ্রা দিল্লি প্রভৃতি নানা স্থানে ঘুরে শান্তিনিকেতনে ফেরেন নভেম্বরের প্রথম দিকে। শান্তিনিকেতনে ফিরেই দিন-দুয়ের মধ্যেই রওনা হয়ে যান দার্জিলিঙে, আবার ১২ নভেম্বর দার্জিলিঙ থেকে ফিরে আসেন কলকাতায়। আবার শান্তিনিকেতনে এলেন বটে কিন্তু ১৬ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন রামগড়ে। রামগড়ে কয়েকদিন থেকে আগ্রায় চলে আসেন, সেখান থেকে জয়পুরেও ঘুরে আসেন। আগ্রা থেকে আবার এলাহাবাদে চলে আসেন। শান্তিনিকেতনে আসেন

২২ ডিসেম্বর। এবার শান্তিনিকেতনে থাকাকালে এই পত্রটি লিখিত হয়।

পত্র ৩৫। ১ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের মে মাসে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। ওই বছরের এপ্রিল মাসে তিনি আমন্ত্রণ পান বলে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন। কিন্তু এই পত্র রচনার তারিখ থেকে মনে হয় এক বছর আগেই এ বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল।

পত্র ৩৬। ১ সম্পূর্ণ শ্লোক :

কুভোজ্যেন দিনং নষ্টং
কুকলত্রেণ শর্বরী।
কুপুত্রেণ কুলং নষ্টং
তন্নষ্টং যন্ন দীযতে।।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস ত্রিবেদী। ১৮৯২ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে যোগ দেবার পর· দুর্গাদাসকে তিনি কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। দুর্গাদাসের পড়াশুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং রিপন কলেজে। পরে দেশে বিষযকর্ম নিযে থাকতেন।

১৩২১ সালে সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওযা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ যে মানপত্র পাঠ করেন, তার উত্তরে রামন্দ্রেসুন্দরের ভাষণ দুর্গাদাসই পড়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন সংবাদপত্রে এই

সংবাদ প্রকাশিত হলে রোগশয্যাশায়ী রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুর্গাদাস রামেন্দ্রসুন্দরের বাসনা রবীন্দ্রনাথকে জানান, তিনিও দুর্গাদাসের সঙ্গে বন্ধুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন।

পত্র ৩৭। ১ ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরেব সহযোগী। খ্যাতনামা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীব পুত্র। ব্যোমকেশের জন্ম ১৮৬৮তে। ১৮৯৯ থেকে ১৯১৬-এর পয়লা এপ্রিলে মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক। পরিষদ পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল' (১৩০৩) এবং শেষ প্রবন্ধ 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম লীলা' (১৩২১)। মধ্যে মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি লোকসাহিত্য এবং ব্যাকরণ-বিষয়ক বেশ-কিছু প্রবন্ধ ওই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী -সম্পাদিত ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল পরিষদ প্রকাশ করে ১৩২১ সালে। ব্যোমকেশের মৃত্যুর পর পরিষদে ব্যোমকেশ মুস্তফী-স্বর্ণপদক প্রবর্তিত হয়।

পত্র ৩৮। ১ রবীন্দ্রনাথ জাপান ও আমেরিকা ঘুরে দেশে ফিবে আসেন ১৯১৭ সালেব ১৩ মার্চ। রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধুত্বপূর্ণ স্নিগ্ধ পত্র যে তাঁর কাছে 'মরুভূমির উৎসধারার মত' মনে হয়েছিল, তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে বিদেশে 'ন্যাশনালিজম' সম্পর্কিত তাঁর ভাষণ এদেশে কারো কারো কাছে ভালো লাগে নি। এ-সমস্ত সমালোচনা তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

এই পত্রে কবি তাঁর মানসিক ক্লান্তি জ্ঞাপন করলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি অনতিবিলম্বে নতুন আদর্শে সবুজ পত্রে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

পত্র ৪০। ১ ১৩২৪ সালের পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী লেখেন ঋকার-তত্ত্ব। এই প্রবন্ধের উত্তরে বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্য লিখলে শাস্ত্রীমহাশয় পুনশ্চ লেখেন " 'ঋ' সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর"। তিনটি একই সঙ্গে ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পত্রিকাধ্যক্ষ।

পত্র ৪১। ১ ৫ জানুয়ারি ১৯১৯ রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে রওনা হন। বাঙ্গালোরের নাট্যনিকেতনের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথ করকে নিয়ে কবি যাত্রা করেন। বস্তুত এ যাত্রা নিছক ভ্রমণ ছিল না, বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। বাঙ্গালোরে কারুশিল্পের উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি প্রবন্ধ পড়েন The Message of the Forest। ২১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি ছিলেন উটকামাণ্ডের শৈলাবাসে। তার পর তিনি কোয়েম্বাটুর পালঘাট সালেম তিরুচিরপল্লী কুম্ভকোনম তাঞ্জোর মাদুরা মদনপল্লী হয়ে আবার বাঙ্গালোরে ফিরে আসেন। মহীশূরে মিথিক সোসাইটিতে ৮ মার্চ তিনি যে ভাষণ দেন তার বিষয় ছিল Folk Religions of India। ১০, ১১, ১২ মার্চ মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত -প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল য়ুনিভারসিটিতে বক্তৃতার বিষয় ছিল Education, Message of the Forest এবং The Spirit of Popular Religion in India.

১৪ মার্চ ১৯১৯-এ তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় যাত্রা

করেন। প্রায় দুই মাস তিনি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন।

২ রামেন্দ্রসুন্দরের ২৩ পৌষ ১৩২৫ তারিখের পত্রের উত্তরে লিখিত। এই পত্রে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাতাশ বৎসর বয়সের কন্যার মৃত্যুসংবাদ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। কন্যাটি ছয় মাসকাল দুঃসহ রোগযন্ত্রণা সহ্য করে মৃত্যু বরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ সমব্যথী হয়ে তাঁর নিজের কন্যাশোকের কথা জানিযেছেন। মাত্র দশ মাস আগে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (ডাকনাম বেলা) মৃত্যু হয় ১৬ মে ১৯১৮। মাধুরীলতার বিবাহ হয়েছিল কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীব সঙ্গে। মাধুরীলতাকে নিয়ে শরৎচন্দ্র পৃথক বাসায় কলকাতায় থাকতেন। অসুখের সময় ববীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাকে দেখতে যেতেন, মৃত্যুর দিন দ্বারের কাছে গিযে সংবাদ শুনে তাকে না দেখেই ফিরে আসেন। মৃত্যুর সময় তাঁব বয়স ছিল বত্রিশ বছব।

রবীন্দ্রনাথ বেলাকে খুবই ভালোবাসতেন। নানা চিঠিপত্রে তার উল্লেখ আছে। মাধুরীলতার সাহিত্যবচনাশক্তি ছিল। তাঁব কোনো কোনো গল্পে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন আছে। 'সৎপাত্র' নামক গল্পটি (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথেব বেনামী বচনা বলেই মনে কবেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের নির্দেশে এ গল্পটি গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।[১]

---

১ 'মাধুরীলতার গল্প' নামে তাঁর গল্পগুলি 'সৎপাত্র' সহ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য 'মাধুরীলতাব গল্প' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮০)

কন্যার মৃত্যুর সাত মাস পর তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন কিন্তু জানুয়ারি মাসে যাত্রার পূর্বেই ডিসেম্বর মাসে তাঁর আরও দুই প্রিয়জনের মৃত্যু হয়— দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ সুকেশী দেবী এবং রবীন্দ্র-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ : রামেন্দ্রসুন্দর-রবীন্দ্রনাথ

পত্র ১। এই পত্রখানি ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লেখা বলে অনুমান করা হয়েছে। অনুমানের কারণ পত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধ ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় তার প্রকাশকাল। এর পূর্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৩০৬এ পত্রিকাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দর পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ প্রার্থনা করেন। ১৩১০ পর্যন্ত তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ ছিলেন; পরে ১৩২৪-এ আর-একবার হয়েছিলেন।

১ রবীন্দ্রনাথ সপ্তম বর্ষের (১৩০৭) পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন —দুটিই ভাষাতত্ত্ব–বিষযক। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম, 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত', চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ'। দ্র. বাংলা শব্দতত্ত্ব।

২ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯) এ সময়ে বঙ্গবাসী এবং মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যাপক ছিলেন। বামেন্দ্রসুন্দরের সান্নিধ্যে তিনি প্রথম আসেন রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় ললিতকুমার ইংরেজি সাহিত্যে কৃতী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পিতা নবীনচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষা লাভ করলেও পূর্বতন পুরুষ ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। ললিতকুমাব ইংরেজি, সংস্কৃত এবং বাংলা তিন ভাষাতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

এখানে ললিতকুমারের যে পূর্বপ্রকাশিত আর-একটি প্রবন্ধের কথা বলা হয়েছে সেটা ভাষাতত্ত্ব–বিষয়ক কিনা বলা যায় না। পরিষৎ পত্রিকায় ইতিপূর্বে তাঁর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি।

পত্র ২। ১ 'কাহিনী' কাব্য ১৩০৬ ২৫ ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি উৎসর্গ করা হয় ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোর দেবমাণিক্যকে।

২ রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন ১৩০৪-এর মাঘ মাসে। এর বিষয় তিনি পেয়েছেন মহাভারতের সভাপর্ব এবং উদ্যোগ-পর্ব থেকে। সভাপর্বান্তর্গত অনুদ্যুতপর্বে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে

তস্মাদয়ং সদবচনাৎ অজতাং কুলপাংসনঃ।

উদ্যোগ পর্বের অন্তর্গত ভগবদ্‌যান পর্বেও গান্ধারী দুর্যোধনকে নিন্দা করেছেন দুর্যোধনকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য

আপ্তমাপ্তং তথাপীদমধিনীতেন সর্বথা।

ত্বং দেবাত্র ভৃশং গর্হ্যো ধৃতরাষ্ট্র সুতাপ্রিয়ঃ।।

নিন্দা করলেও রবীন্দ্রনাথের গান্ধাবীব উক্তিতে যে মহৎ আদর্শের প্রকাশ হয়েছে, এই দুই স্থলে সে রকম নেই। রবীন্দ্রনাথ গান্ধাবীর বক্তব্যকে যেমন বিস্তৃত করেছেন ভানুমতী ও দ্রৌপদীর সঙ্গে সংলাপেও সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা নিয়ে এসেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর 'গান্ধারীর আবেদন' পূর্বেই শুনেছিলেন বলবার তাৎপর্য এই যে ১৩০৪ সালের ১ ফাল্গুন (১৪ মার্চ ১৮৯৮) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে পড়ে শোনান। রামেন্দসুন্দর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৩ রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে ১৮৮১তে রচিত ও অভিনীত হয়। অভিনীত হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি। পরের দিনই ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধাবণী পত্রে অভিনয়ের সংবাদ বিস্তৃতভাবে মুদ্রিত হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। তরুণ রামেন্দ্রসুন্দর

দর্শকের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু কাগজে এর বিবরণ পড়েছেন। কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভার উদ্ধৃতিসহ অভিনয়ের সংবাদ কোন্ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল জানা যায় নি।

৪ 'ভাষা ও ছন্দ', ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫-এ প্রকাশিত।

৫ 'সতী' নামক গাথা কবিতা রচিত হয় ১৩০৪-এর ২০ কার্তিক। কবিতার শিরোনামে তারকাচিহ্ন দিয়ে পাদটীকা ছিল 'মিস ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেবের বচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।'

৬ কবিতার নাম 'নরকবাস', রচিত হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৪। এই কাহিনী মহাভাবতের বনপর্বের।

৭ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' রচিত হয ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪-এ। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'কথা' এবং 'কাহিনী' নামে রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাট্যকাব্য গান্ধারীর আবেদন সতী নরকবাস লক্ষ্মীর পরীক্ষা ও কর্ণকুন্তী সংবাদের সঙ্গে ভাষা ও ছন্দ এবং পতিতাকে অন্তর্ভুক্ত কবে 'কাহিনী' কাব্য এবং গাথা কবিতাগুলি নিয়ে 'কথা' কাব্য। 'কথা' উৎসর্গ করেন জগদীশচন্দ্র বসুকে।

৮ চিত্রা কাব্যের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণ' নামক কবিতা প্রকাশিত হয় সাধনায় ফাল্গুন ১৩০১ সালে। সত্যকাম-জবালার কাহিনী ছান্দোগ্য উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত।

৯ জগদীশচন্দ্র বসুর অনুবোধে কর্ণ চরিত্রের মহত্ত্ব ফোটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ১৫ ফাল্গুন ১৩০৬-এ এই কবিতা লেখেন। তখন 'কাহিনী' কাব্যের মুদ্রণ চলছিল। কবিতাটি তাতে সন্নিবিষ্ট হয়।

১০ পত্রসংখ্যা ১-এ 'বৈশাখের পত্রিকার জন্য আর একটি প্রবন্ধের ভিক্ষার্থী' উক্তিতেই দেখা যায়, একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ পাঠালেও রামেন্দ্রসুন্দর আরো একটি প্রবন্ধ চান। বর্তমান চিঠিতে দ্বিতীয় প্রবন্ধের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত— প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত' প্রকাশিত হওয়ার পর চতুর্থ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' মুদ্রিত হয়। পরবর্তী বৎসরে লেখেন 'বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত'।

পত্র .৩। ১ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতার পঙ্‌ক্তি। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনাকে দেশসেবার অঙ্গ হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বলেই 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতা থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। স্মরণীয় এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে জেনারেল অ্যাসেমব্লির যে-সভায় রবীন্দ্রনাথ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ পড়েন, সেই সভার শেষে দর্শকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন। চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে ওই সভা হয়, সম্ভবত রামেন্দ্রসুন্দর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২ সঙ্গীতসমাজ অথবা ভারতসঙ্গীত সমাজের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীত সমাজের স্থাপনের সূচনা কী ভাবে হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে তার বিবরণ দিয়েছেন :

'পুণায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে তথাকার 'গায়নসমাজ' দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভাস্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি 'গায়ন-সমাজের' আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন। উদ্দেশ্য —বাঙ্গালাদেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীত অধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গালার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন।

তদনুসারে শীঘ্রই এক অনুষ্ঠানপত্র প্রস্তুত হইল। সকল সংবাদ পত্রেই এই অনুষ্ঠানপত্র এবং উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত হইল। দেশের অনেক সুধী এবং দেশহিতৈষী মহাত্মা এইরূপ একটি সমিতি বা সঙ্ঘের অভাব ও তন্নিবারণের আবশ্যকতা বুঝিলেন। সভাস্থাপনকল্পে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতিবাবু ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন।... সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'।

প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত। সকল শ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। ... কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।'

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় –প্রণীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬), পৃ ২১৭-২১

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ভারতসঙ্গীত সমাজে'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। আগে ছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে, প্রতিষ্ঠাবর্ষ ২৭ জানুয়ারি ১৮৯৮। নতুন করে এর আরম্ভ হল ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' 'পুনর্বসন্ত' 'বসন্তলীলা' 'হিতে বিপরীত' 'অলীকবাবু' প্রভৃতি বহুবার অভিনীত হয়েছিল।

সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সমকালীন বিভিন্ন চিঠিপত্রে তিনি এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটি সঙ্গীত সমাজে অভিনীত হয়। ১৯০০

সালের ১৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্যবর্মনের সংবর্ধনা উপলক্ষে অভিনীত হয় 'বিসর্জন'। রবীন্দ্রনাথ তাতে রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। রামেন্দ্রসুন্দর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিসর্জন সঙ্গীতসমাজে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ডিসেম্বর ১৯০০। তাতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।[১]

৩ বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্র। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২০ আগস্ট ১৮৯৯) পূর্বে তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়, গদ্যপ্রবন্ধের বই 'চিত্র ও কাব্য' (১৮৯৪), কাব্য 'মাধবী' (১৮৯৬) এবং 'শ্রাবণী' (১৮৯৭)। মৃত্যুর পর বলেন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত বচনাগুলি সংকলন করে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেব সম্পাদনা করেন রামেন্দ্রসুন্দর। এতে বিক্ষিপ্ত রচনা ছাড়া ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিও ছিল। তৎসত্ত্বেও এই গ্রন্থাবলি বলেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ রচনার সংকলন নয়। দীর্ঘকাল পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ সম্পূর্ণতর রচনাবলি প্রকাশ করে ১৩৫৯ সালে। প্রথম গ্রন্থাবলির রামেন্দ্রসুন্দর-কৃত সমালোচনামূলক ভূমিকা প্রবন্ধটি তাঁব 'চরিতকথা'য় সংকলিত হয়।

বলেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবন তাঁর সাহিত্যরচনা ছাড়াও

---

১ প্রথম অনুষ্ঠানেব বিবরণ দিয়েছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' (১৩৫৬) বইতে। যতীন্দ্রমোহন বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-দক্ষতায় অভিভূত হন।

ব্রাহ্মসমাজ গঠনে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনে সহায়তা প্রভৃতি উদ্যমে পূর্ণ। সাহিত্যসাধকচরিতমালায় তাঁর জীবনী দ্রষ্টব্য।

৪ এ আবেদন কিসের বলা যায় না। এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর, সাহিত্য পরিষদের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সে বিষয় স্মরণ করার সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতাও অবশ্য স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেই পরিষদ-হিতাকাঙ্ক্ষী রামেন্দ্রসুন্দর মহারাজার সাহায্য প্রার্থনায় পরিষদের কোনো আবেদন পাঠানোর কথা ভেবে থাকতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপবিবারের যোগ বহু পূর্ব থেকেই। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নহৃদয় (১২৮৮) কাব্য পড়ে তৎকালীন ত্রিপুরার মহাবাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য অভিভূত হন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। সেই সূত্রে এই যোগ স্থাপিত হয়। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষি উপন্যাস ও বিসর্জন নাটকেব প্রাচীন কাহিনী বীরচন্দ্রের সৌজন্যেই সংগ্রহ করেন। বীরচন্দ্র কলকাতায় এলেই রবীন্দ্রনাথকে ডেকে নিতেন। বীবচন্দ্র ছিলেন সংগীতবিশারদ, রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তার উল্লেখ করেছেন। ১৩০৩-এ বীরচন্দ্রেব মৃত্যু হলে রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বাজ্যভাব নেন। তিনিও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলেছেন। রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথকে আগরতলায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে সংবর্ধনা জানান। জগদীশচন্দ্র বসু যখন বিলাতে গবেষণার জন্য অর্থের অভাব বোধ করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাধিপতির কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তাঁকে সাহায্য করেন। পরেও ত্রিপুরার রাজ্যপরিচালনার

আদর্শ, এবং পুত্রদের শিক্ষাদান সম্পর্কে মহারাজা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাহিনী' কাব্য ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেব মাণিক্যকেই উৎসর্গ করেন। মহারাজা কলকাতায় এলে তাঁর সম্মানার্থে বিসর্জন নাটকের অভিনয় হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

ত্রিপুরাধিপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের কথা রামেন্দ্রসুন্দরের অবশ্য সুজ্ঞাত ছিল। রাধাকিশোরের সাহিত্যপ্রীতি ও বদান্যতার কথাও তিনি জানতেন। সেই সূত্রেই পরিষদের, আবেদনপত্র মহারাজার নিকট পাঠানোর কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ত্রিপুরার মহারাজা কবি হেমচন্দ্রকে মাসিক ত্রিশ টাকা এবং নগদ দুশো টাকা সাহায্য করেন। হেমচন্দ্রের তখন দুঃস্থ অবস্থা। সে-সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য সহৃদয় দাতা তাঁকে সাহায্য করেন।[২] সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণীতে (২৫ আষাঢ় ১৩০৬) এই দানের জন্য ত্রিপুরার মহারাজকে এবং 'দান সংগ্রহে বিশেষ যত্ন' করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ জানানো হয়।[৩]

পত্র ৪। ১ দিঘাপতিয়ার জমিদার। শরৎকুমার রায় বিদ্যোৎসাহী দানশীল ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে শরৎকুমারের উদার ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার ব্যক্তিগত স্মৃতি

---

১ ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ এবং যোগাযোগের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা : ১৯৮৭।

২ মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড, ১৩৩০, পৃ ২৪৫।

৩ প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ৪, ১৩৯৫, ২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত।

রচনা করেছেন। শরৎকুমার সাহিত্যপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৩০৭-এ তিনি পরিষদের অন্যতম ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩১৪, ১৩১৫ এবং ১৩১৬তে তিনি পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে আড়াই হাজার টাকা দান করেন।

শরৎকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বহুপূর্ব থেকেই। ছিন্নপত্রে কোনো কোনো পত্রে দিঘাপতিয়ার স্থান নির্দেশ আছে। শরৎকুমারও লিখেছেন, জলপথে যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন।
২ রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৪-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০-১৯২৫) ছিলেন সেকালের ব্রাহ্ম সমাজসেবী। সমাজোন্নতি সমিতি, সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, শ্রমিকশিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্র, সেভিংস ব্যাঙ্ক, কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির শিশুবিদ্যালয় প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান তিনি সংগঠন করেন। 'ভারতশ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশ করেন, শ্রমিকদের কল্যাণে মহিলাদের জন্য প্রকাশ করেছিলেন 'অন্তঃপুর' (১৮৭৩)। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে হিন্দু খৃস্টান মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের ধর্মশিক্ষার জন্য স্থাপন করেন দেবালয়। তাঁকে 'সেবাব্রত' উপাধি দেন নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ। 'শশিপদ ১৭ পৌষ [শুক্র 1 Jan 1909] একটি ট্রাস্টডীড সম্পন্ন করে সমিতির কার্যভার কয়েকজন ট্রাস্টীর হাতে সমর্পণ করেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন সভাপতি। সমিতির মুখপত্র 'দেবালয়' বৈশাখ ১৩১৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা এই পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।'[১]

১ রবিজীবনী ৬, ১৯৯৩, পৃ ১৩

৩ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ৬-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪ শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) ছিলেন তিব্বতীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮৭৯ এবং ১৮৮১ খৃস্টাব্দে তিনি তিব্বতে পুঁথিপত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহে যান। তা ছাড়া চীন জাপান এবং শ্যামদেশেও যান। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৩১৯-এ তাঁর ক্ষেমেন্দ্র-রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র অনুবাদ চারখণ্ডে প্রকাশিত হয় সাহিত্য পরিষদের ভারতশাস্ত্রপিটক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরেব 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৩১৮)।

৫ ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২০ আগস্ট 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বর্তমান পরিষদভবনের ভূমি দান কবেন। পরিষদের পক্ষে পাঁচজন সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শবৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ন্যাসরক্ষক নিযুক্ত হলেন। ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় ভাড়াটে বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে চলে আসে। বিভিন্ন বদান্য ব্যক্তিদের দানে এই বাড়ি তৈরি হয়। দ্রষ্টব্য পরিষৎ পরিচয় পৃ ২৫-২৬।

পত্র ৫। ১ সুইডিস কমিটি রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছে, এ-খবর কলকাতায় পৌঁছয় ১৪ নভেম্বর ১৯১৩-তে। এই দিন বিকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এই খবর পান। সান্ধ্য দৈনিক *Empire*-এ এই সংবাদ প্রচারিত হয় ১৪ নভেম্বর শুক্রবার : ২৮ কার্তিক। রামেন্দ্রসুন্দর ৩০ কার্তিক ১৩২০ এই চিঠি লেখেন।

পত্র ৬। ১ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, রামেন্দ্রসুন্দর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে বা নৌকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে কালনার কাছে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। এই চিঠি লেখার কয়েক দিন আগে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্বকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবত তার পরেই তিনি ভ্রমণে যান।

২ 'আশুতোষ বাজপেয়ী তাঁব রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথায় রামেন্দ্রসুন্দরের পরোপকারিতার যে সব দৃষ্টান্ত দিযেছেন, তার মধ্যে এই "বালক" ব্রজেন্দ্রের উল্লেখ ও পরিচয় রয়েছে। ব্রজেন্দ্রের তখন ন'বছর বয়স। মধুসূদন লেনে অনাথ অবস্থায় বালকটিকে ঘুবে বেড়াতে দেখে রামেন্দ্রসুন্দরেব অন্তরে করুণা জাগে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, যশোহর জেলার বাঘডাঙ্গা গ্রামে তার বাড়ি। বিপদে পড়ে অসহায অবস্থায এখন পথে পথে ঘুরছে। রামেন্দ্রসুন্দর টাকা দিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তার পডাশুনাব ব্যবস্থাদিও করেন ; কিছুকাল পরে ব্রজেন্দ্র বাড়ি থেকে চলে আসে, জানায তার যেরকম নিদারুণ দুঃস্থ অবস্থা তাতে পড়ার সুবিধা হচ্ছে না, যদি তাব কোনো চাকরি করিয়ে দিতে পারেন। রামেন্দ্রসুন্দব কবিকে অনুরোধ জানান তাঁর জমিদারীতে ব্রজেন্দ্রব চাকবিব ব্যবস্থাও হয়।'[১]

৩ রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' ১ বৈশাখ ১৩২০ ইং ১৯১৩-তে প্রকাশিত হয়। বস্তুত ভূমিকার তারিখ এরকম থাকলেও আসলে বই প্রকাশিত হয় আরও পরে। ঠিক একবছর পর রামেন্দ্রসুন্দর এই পত্রটি লিখছেন। সংকলিত প্রবন্ধের নাম, মুক্তির পথ, বৈরাগ্য,

---

১ দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৫, পৃ ৪০

জীবন ও ধর্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্মপ্রবৃত্তি, আচার, ধর্মের প্রমাণ, ধর্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পূজা, ধর্মের জয়, যজ্ঞ।

রামেন্দ্রসুন্দরেব 'যজ্ঞে'র ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'জাতিভেদ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা বিবৃত করেছেন তাতে এর প্রমাণ আছে।

পত্র ৭। ১ জিজ্ঞাসার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১৪তে (১৩২১)। নতুন সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধ সহ এই সংস্করণের প্রবন্ধ সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত প্রথম অধ্যায়, অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় অধ্যায়, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্যসমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুলপূজা।

রামেন্দ্রসুন্দর 'মায়াপুরী' প্রবন্ধটি পরিষদমন্দিরে পড়েন ১৩১৬, ২ আশ্বিন। ওই সভায় সভাপতি ছিলেন সারদাচরণ মিত্র। ববীন্দ্রনাথের লেখা ১৭. ৯. ১৯০৯-এর পত্রে (পত্র ২০) জানা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে আগ্রহী এবং রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য পত্রে জানা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর আগে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হলেও বামেন্দ্রসুন্দরের কৃতজ্ঞতাবোধ অম্লান।

২ ১৯১৪, ৫ ভাদ্র ১৩২১-এ রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ থেকে তাঁকে অভিনন্দন ও সংবর্ধনাজ্ঞাপন করা হয়। তখন পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি পরিষদের পক্ষ থেকে রুপার পাতে খোদিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। পত্রখানি তাঁর দ্বারাই রচিত।

এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে বোলপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন পরিয়ে দেন এবং স্বরচিত এবং স্বহস্তলিখিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিনন্দন পত্রটি সুপরিচিত।— সেটি যথাযথ উদধৃত হল :

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যেব মধ্যগগনে আরোহণ কবিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমাব ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্যপরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বাং প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামাহে

প্রিয়জনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান কবি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি। বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি। ৫ই ভাদ্র ১৩২১।

পরিষদেব সংবর্ধনাব উত্তরে বামেন্দ্রসুন্দব প্রসঙ্গত বলেন :

'আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান ও সংবর্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমাব সেব্য-সেবক সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি পবিষদেব পরিচর্যা করিয়াছি— একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্যা কবিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন ; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে কবিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘ্য মনে করিব। পরিষদেব প্রসাদ আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম।'

—'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' (সাহিত্য-সাধকচরিতমালা) থেকে উদধৃত।

৩ সবুজপত্রে রামেন্দ্রসুন্দবের 'কর্মকথা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। তবে, অজিতকুমার চক্রবর্তী কর্মকথার সমালোচনা লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি তাঁর 'বাতায়ন' বইতে সংকলিত আছে। ভূমিকা থেকে জানা যায় প্রবন্ধটি ১৩১৮ থেকে ১৩২০

সালের মধ্যে লিখিত হয় এবং শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধপাঠসভায় পাঠিত হয়েছিল। 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই রচনাকালে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।'

পত্র ৮। ১ রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবীর মৃত্যু।

২ 'নগ্ন মূর্তি মরণের' এই বাক্যখণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'মৃত্যুর পরে' নামক কবিতায় আছে :

সকল অভ্যাস-ছাড়া
সর্ব আবরণহারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের
নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কন্যাকেও হারিয়েছেন। দ্রষ্টব্য রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৪১-সংখ্যক পত্র। রবীন্দ্রনাথের ওই পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের বর্তমান পত্রের উত্তরে লিখিত।

৩ এব সঙ্গে তুলনীয় রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্ম-কথা'র অন্তর্গত 'ধর্মের জয়' প্রবন্ধের 'প্রাণিসমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্দয় নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবন-সংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়। যাঁহারা আমাদের এই পরাজয়ে নিয়তির মঙ্গলহস্ত দেখিতে পান, তাঁহারা সুখী। তাঁহাদের সেই সুখে আমার অধিকার নাই। আমি এই পরাজয় মাত্রই দেখিতে পাই; ভবিতব্য আমার নিকট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।' ধর্মের জয় প্রবন্ধের প্রকাশ মাঘ ১৩১০-এর সাহিত্য পত্রিকায়।

বিজ্ঞপ্তি

ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রগুলি প্রকাশ করেন। বর্তমান চিঠিপত্রের খণ্ডটি ওই মুদ্রিত পত্রের সংকলন। সর্বশেষের পত্রের (১৩ বৈশাখ ১৩৪১) হস্তলিখিত রূপ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

এ ছাড়া যদুনাথ সরকার রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে যে পত্র লিখেছিলেন, সেটিও যদুনাথ ১৩৫২-র চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশ করেছিলেন। মূলপত্রটি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় আছে। মুদ্রিতরূপের সঙ্গে তার কিছু অনৈক্য দেখা যায়। আমরা মূল পত্রের পাঠই অনুসরণ করেছি।

যদুনাথ পত্রগুলি যখন প্রকাশার্থ দেন, তখন তাতে কিছু স্বকৃত টীকা যোগ করেছিলেন। সেই টীকা আমাদের কাজে লেগেছে, যথাস্থানে তার উল্লেখও করা হয়েছে। ওই পত্রগুলির সঙ্গে যদুনাথ তাঁকে লেখা সি. এফ. অ্যান্ডরুজের কয়েকটি পত্রও সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। সেই পত্রও আমরা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছি।

মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনটি রচনা যুক্ত হয়েছে। প্রথম, ১২-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত স্যার মাইকেল স্যাডলারের এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে মন্তব্য। এই দুষ্প্রাপ্য রিপোর্ট এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে যদুনাথের পূর্বোক্তপত্রের প্রতিলিপি। তৃতীয়, ১৮৯৪তে সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোগল্প লিখতে আরম্ভ করেন, তখন সেই গল্প সম্পর্কে যদুনাথের প্রবন্ধ A New Leaven in Bengal। এই প্রবন্ধ ১৩০১ বঙ্গাব্দের সুহৃদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই দুষ্প্রাপ্য রচনার একটি টাইপ কপি রবীন্দ্রভবনে পাওয়া গিয়েছে।

স্বীকৃতি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি সবই শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৮৫-র দেশ পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যায় পত্রপরিচিতি-সহ প্রকাশ করেছিলেন। সে-সময় পত্রপ্রসঙ্গে তিনি যা লেখেন তার প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

'রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে যে-সব পত্রবিনিময় হয় তারই যতগুলি সন্ধান পাওয়া গেছে এইখানে মুদ্রিত হোল। আমাদের বাড়ি থেকে এক সময়ে (১৩২৮-১৩৩৪) 'বঙ্গবাণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত। সেই পত্রিকায় ছাপানোর উদ্দেশ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয় শ্রীরমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ও রামেন্দ্রসুন্দরের পত্রাবলী সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৪১টি পত্রের মধ্যে ২৬ খানি (এই প্রবন্ধে মুদ্রিত পত্রসংখ্যা— ১, ৫-২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৩২-৩৫) বঙ্গবাসী পত্রিকাব ষষ্ঠ বর্ষে (১৩০০-৩৪) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। সেগুলি এখানে পুনর্মুদ্রিত হোল। অবশিষ্ট ১৫খানি পত্রও সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

'উপবোক্ত ৪১খানি পত্রের মধ্যে ৫খানি চিঠি (৬, ১৮, ২৫, ৩৪, ৩৮ সংখ্যক) আশুতোষ বাজপেয়ী মহাশয়ের 'রামেন্দ্রসুন্দর-জীবনকথা' গ্রন্থে (চৈত্র ১৩৩০) অংশত উদ্ধৃত হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত পত্রগুলি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে অনুলিপি আনিয়ে তাঁদের সহযোগিতায় সেগুলি প্রকাশিত হোল। এই পত্রগুলির মধ্যে পত্রসংখ্যক

৭ (৯ অগ্রহায়ণ ১৩২১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'রামেন্দ্র-রচনা সংগ্রহে' ছাপা হয়েছে।

'উভয়ের পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনায় অনুমান হয় যে রামেন্দ্রসুন্দরের অনেকগুলি চিঠি রক্ষিত হয় নি, অন্তত এখনো সন্ধান মেলে নি।

'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিতে তারিখ অথবা সাল দেওয়া নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের একটি পত্রে (সংখ্যক ১) সাল নেই। ঐসব পত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে আনুমানিক কাল নির্ণয় করে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।'

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পত্রগুলি সুচারুরূপেই সম্পাদনা করেন। আমরা পত্রের ধারাবাহিক ক্রম যথাযথ রক্ষা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ৩২-সংখ্যক পত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা নয় বলে আমাদের মনে হয়েছে। এ বিষয়ে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি আমাদের ধারণা সমর্থন করে পত্র দেন। পত্রসংখ্যার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই পত্রটি পূর্বোক্তক্রমেই উপযুক্ত টীকা সহ বিন্যস্ত হল। উমাপ্রসাদের রচিত পত্রপরিচিতি থেকে আমরা প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করেছি। এজন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

চিঠিপত্রের বর্তমান খণ্ড সম্পাদনাকাল রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন গবেষণা-সহায়িকা ড. সাধনা মজুমদারের সহায়তা উল্লেখযোগ্য এবং গ্রন্থ-সম্পাদনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমার প্রাক্তন ছাত্র 'রবিজীবনী'কার শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহভুক্ত যদুনাথ সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল পত্র শ্রীঅনাথনাথ দাসের সৌজন্যে মেলানো সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ একসময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন। সে সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কাগজপত্র থেকে তথ্য উদ্ধারে সহায়তা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহকর্মসচিব ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ।

দীর্ঘকাল ধরে সম্পাদনাকর্ম চলাকালীন রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার এবং অভিলেখাগারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনাকে ত্রুটিমুক্ত করবার কাজে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর বিশেষ অভিনিবেশের কথা এইসঙ্গে স্মরণীয়।